সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র
তৃতীয় বর্ষ, ১১তম সংখ্যা ›› ডিসেম্বর ২০১৭ ›› পাঁচ টাকা

গাঢ় লিকারের কষ্ট

আধুনিক নাগরিক সভ্যতা, কত ব্যস্ত মানুষ, কত বিচিত্র তার প্রকাশ। ভোরের আলোর সাথে পাল্লা দিয়ে জেগে ওঠে আরও একটি কর্মমুখর দিন। মানুষ ছুটে চলছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। তারই মাঝখানে একটুখানি অবসর, জিরিয়ে নেয়া। কুঁড়েঘর থেকে রাজপ্রাসাদ, ঘরোয়া আড্ডা থেকে রাষ্ট্র নেতাদের সংগোপন বৈঠক সর্বত্র তো এই একই চিত্র। *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

জেরুজালেম ইসরায়েলের রাজধানী- ট্রাম্পের এ ঘোষণা দখল আর হত্যাকেই স্বীকৃতি দিল

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৬ ডিসেম্বর জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানান।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "জেরুজালেম মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টান – এই তিন ধর্মাবলম্বী, মানুষদের জন্য পবিত্র স্থান। আন্তর্জাতিকভাবে যারা স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেন, তারা জেরুজালেমকেই প্যালেস্টাইনের রাজধানী হিসেবে স্বীকার করে নেন। যারা স্বীকার করেন না, তারাও এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখেন। ট্রাম্পের এই ঘোষণা এ অঞ্চলের অস্থিতিশীলতা আরও বাড়িয়ে তুলবে। সংঘাত-সংঘর্ষে প্রাণ হারাবে অসংখ্য মানুষ। সর্বোপরি ১৯৪৮ সালের বেঁধে দেয়া সীমা লঙ্ঘন করে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে বছরের পর বছর ধরে যে আগ্রাসন চালাচ্ছে, মানুষ হত্যা করছে – তাকে স্বীকৃতি দেয়া হলো এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে।"

স্বাধীনতার ৪৬ বছর
কী পেল দেশের মানুষ?

এবছর স্বাধীনতা যুদ্ধের ৪৬ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। গোটা দেশজুড়ে মহাসমারোহে উদযাপিত হবে বিজয় দিবস। প্রতিবছরই হয়। এবছরও হবে। উন্নয়নের ঢামাঢোল আর মুক্তিযুদ্ধে শাসকদল আওয়ামী লীগের কৃতিত্ব প্রচারে ব্যস্ত রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমসহ সমস্ত গণমাধ্যম। এই প্রচারের জৌলুস এড়িয়ে কেউ চোখ রাখবে কি সত্যিকারের ইতিহাসের দিকে? গত ৪৬ বছরে যারাই ক্ষমতায় এসেছে – নিজেদের মত করে সাজিয়েছে ইতিহাসের বয়ান। তাদের সেই কীর্তিস্তম্ভে চাপা পড়েছে এদেশের শ্রমিক-কৃষকের কণ্ঠস্বর। যে হাড়জিরজিরে কৃষক-শ্রমিক একদিন নেংটি পড়ে জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করে ঝাপিয়ে পড়েছিল স্বদেশকে মুক্ত করার ব্রতে, যে ছাত্র একদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর তথাকথিত ভবিষৎ ক্যারিয়ারের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে জীবন আহুতি দিয়েছিল দেশবাসীর স্বপ্নপূরণে – আজকে বিজয় দিবসের সভায়- স্লোগানে তাদের নাম নেই, তাদের স্বপ্নের কথা সেখানে আর উচ্চারিত হয় না। ঘর-বাড়ি, বাবা-মা, প্রিয়জনের সান্নিধ্য ছেড়ে কোন্ স্বপ্নে তারা জীবন বাজি রেখেছিল?

পাকিস্তানি প্রায়-ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণে প্রাণ ওষ্ঠাগত শ্রমিক চেয়েছিল এমন একটি দেশ – যেখানে মানবিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সে সংগ্রহ করতে পারবে এমন মজুরি, কৃষক চেয়েছিল– তার শ্রমে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম সে পাবে, বারো মাস খাবার জুটবে, সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে। ছাত্ররা চেয়েছিল – একটি মানুষও যেন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, অর্থের প্রাচীর যেন শিক্ষাগ্রহণের পথে বাধা হয়ে না দাড়ায় – এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা। সর্বোপরি সবাই স্বপ্ন দেখেছিল এমন একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজের – যেখানে সমস্ত মানুষের মানবিক গুণাবলি বিকাশের সুযোগ অবারিত হবে, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-লিঙ্গের প্রভেদ (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি লুটপাটকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য

গত ৩০ নভেম্বর দুটি বামপন্থী জোট – গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও সিপিবি-বাসদ এর ডাকে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হলো। বিদ্যুতের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার ও চালসহ নিত্যপণ্যের দাম কমানোর দাবিতে ডাকা এ হরতালের প্রচারকালে কথায় কথায় একজন বলছিলেন, 'সংবিধান মতে দেশের মালিক আমরা হলেও বাস্তবে আমরা হলাম ভাড়াটিয়ার মতো। অনেক বাড়িওয়ালা যেমন ইচ্ছামাফিক ভাড়া বাড়িয়ে চলে, মওকা খোঁজে ভাড়া বাড়ানোর, সরকারও তেমনটিই করছে।' ভদ্রলোকের মিল খোঁজার ধরনটি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সীমিত আয়ের জীবনযাপনে জেরবার মানুষের আর্তধ্বনিটি সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এ সংবেদন বোঝার সাধ্য সরকারের নেই। জনগণের টুটি চেপে ধরে এভাবেই সরকারের 'উন্নয়ন' কর্মকাণ্ড চলছে।

দাম বাড়ার আসল কারণ

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর অজুহাত হিসেবে সরকার বলেছে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নাকি ৫৩৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা লোকসান হয়েছে! বর্তমানে প্রতি ইউনিট পাইকারি বিদ্যুতের গড় সরবরাহ ব্যয় ৫.৫৯ টাকা আর পিডিবি বিক্রি করে ৪.৮৭ টাকা। এ হিসেবে প্রতি ইউনিটে লোকসান হয় ৭২ পয়সা। এ বিপুল আর্থিক ক্ষতি সমন্বয়ের জন্যই নাকি বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এটি দাম *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্প
পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার বিপদ

'বিদ্যুৎ চাই', 'উন্নয়ন চাই' – এমন কথা বাংলাদেশে খুব শোনা যাচ্ছে। বিশেষত বর্তমান আওয়ামী মহাজোট সরকারের পক্ষ থেকে জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে, বিদ্যুৎ না হলে উন্নয়ন হবে না, আর তাই যেকোনো মূল্যে বিদ্যুৎ চাই। সরকারের এই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি সুন্দরবনের জন্য বিপজ্জনক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও আলোচনায়। রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিষয়টিও ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এবং এখানেও সরকারের মনোভাব পুনর্বার প্রকাশ পেল প্রধানমন্ত্রীর কথায়।

রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধনের সময় দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন : "আমরা সব ভেবেচিন্তেই করছি। এটা হবেই, সমালোচনা করে লাভ নেই।" আসলে শুধু রূপপুর নয়, রামপাল কয়লাবিদ্যুৎ কিংবা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষা – কোনোটা নিয়েই সমালোচনা করে লাভ হচ্ছে না। কারণ সবই তারা ভেবেচিন্তে করছেন, আর এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার দ্বিতীয় কেউ দেশে নেই। দেশের জন্য যা ভাববার, যা করবার, সব তারাই করবেন। বাকিদের কাজ হলো, (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাম ঐক্য প্রসঙ্গে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি চাই

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই ক্ষমতা দখলে রেখেছে। এর মাধ্যমে তারা আপাত অর্থে গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের বুর্জোয়া নির্বাচনী ব্যবস্থাকেও অকার্যকর করে ফেলেছে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতেও সুষ্ঠু ভোট হয়নি। ফলে আগামীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও জনগণ ভোট দিতে পারবে কি'না – তা নিয়ে সংশয় আছে। আওয়ামী লীগ সরকারের গণবিরোধী নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, দমনমূলক শাসন, চূড়ান্ত লুটপাট-দুর্নীতি, দখলদারিত্ব, দলীয়করণ সবকিছু মিলে মানুষ অতিষ্ঠ। অন্যদিকে, প্রধান বিরোধী দল বিএনপি অতীতে একই কায়দায় দেশ চালিয়েছে। বর্তমানেও জনস্বার্থ নিয়ে জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলনের রাস্তায় তারা নেই। আওয়ামী লীগের ওপর ক্ষুব্ধ মানুষ অন্য উপায় না পেয়ে তাদের ভোট দেবে – এই আশায় তারা আছে। কিন্তু ভোটের (৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্প : পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার বিপদ

(১ম পৃষ্ঠার পর) দেখে যাওয়া আর বাহ্‌বা দেয়া।

পাবনার রূপপুরে ২৪০০ মেগাওয়াটের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে গত ২৬ জুলাই ২০১৬ রাশিয়ার সাথে ঋণচুক্তি করেছে সরকার। সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার ঋণ, প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তার উপর নির্ভর করে বিপুল ব্যয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প নিয়ে সচেতন ও বিশেষজ্ঞ মহলে বহুদিন ধরেই উদ্বেগ বিরাজ করছে। মূলত ৪টি কারণে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে আপত্তি উঠেছে। প্রথমত, এর বিপুল ব্যয় ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বারবার ব্যয়বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ান কোম্পানির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা ও দেশে দক্ষ জনবলের ঘাটতি। তৃতীয়ত, তেজস্ক্রিয় দূষণ ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি। চতুর্থত, বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংকট। এছাড়াও এখানে উৎপাদিত বিদ্যুতের উচ্চ দামও একটা আপত্তির বিষয়। এসব আপত্তি উপেক্ষা করেই গত ৩০ নভেম্বর '১৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের কংক্রিট ঢালাই উদ্বোধন করলেন।

এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা শুরুর একটা কথা সামান্য আলোচনা করে নিতে চাই। বিদ্যুৎ হলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হয়, এটা সত্য। কিন্তু বিদ্যুৎ, আমাদের মতো দেশগুলিতে, আরো বড় সুবিধা নিয়ে আসে ব্যবসায়ী মহলের জন্য। বিদ্যুৎ বিরাট বাজার খুলে দেয়। বিদ্যুৎ হলে লাইট, ফ্যান, টিভি, ফ্রিজ বিক্রি হয়; এমনকি যেসব এলাকায় দিনে ৪/৫ ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ থাকে না সেখানেও। এছাড়া বাংলাদেশে এখন গার্মেন্ট, ঔষধ, সিরামিক, চামড়া, খাদ্যদ্রবসহ বিভিন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পের বাড়বাড়ন্ত। এসব শিল্পের নতুন নতুন কারখানা করার জন্য বিদ্যুৎ চাই। আর সে কারণেই এ কথা বললে ভুল হবে না যে ব্যবসায়ী শিল্পপতি মহলের বিদ্যুতের চাহিদাকে জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে 'উন্নয়ন' বলে চালানো হচ্ছে।

পরমাণু বিদ্যুৎ : সারা বিশ্বের অভিজ্ঞতা কী বলে?

জাপান প্রযুক্তিতে অত্যন্ত অগ্রসর একটি দেশ। বাংলাদেশের তুলনায় তো বটেই, সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটেও। ২০১১ সালে ভূমিকম্প ও সুনামির সময় জাপানের ফুকুশিমা পরমাণু কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তেজস্ক্রিয় দূষণ ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষণীয় হলো, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে আমাদের চেয়ে বহুগুণ উন্নত হয়েও জাপান নতুন কোনো পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা দেয়নি। বরং জাপানের তখনকার প্রধানমন্ত্রী নাওতা কান মন্তব্য করেন যে জাপানের পরমাণুকেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে ফেলা উচিত।

জাপানের ঘটনার পর পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দেশ জার্মানি ও ফ্রান্সে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় ঘটে গেছে। জার্মানি তাৎক্ষণিকভাবে দেশের ৭টি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করে। পরমাণু জ্বালানি ইস্যুকে ঘিরেই ২০১২ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ৫৮ বছর ধরে ক্ষমতাসীন সিডিইউ সরকারের পতন ঘটে। সেখানে পরমাণু জ্বালানির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে গ্রিন পার্টি বিজয়ী হয়। এমন পরিস্থিতির মধ্যে জার্মানি ঘোষণা করে যে ২০২২ সালের মধ্যে সমস্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ধাপে ধাপে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কতটুকু নিরাপদ?

পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি চলে আসে তা হল এর নিরাপত্তা ও প্রযুক্তির বিষয়টি। বিজ্ঞানের যেকোনো আবিষ্কারই এক ধাক্কায় সফলতার মুখ দেখে না, এবং সে কারণেই প্রতিটি প্রযুক্তিই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিখুঁত ও নিরাপদ হতে থাকে। প্রযুক্তি এবং আর্থিক সামর্থ্যে অগ্রসর দেশগুলো পরমাণু প্রযুক্তি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো দেশই পরমাণু জ্বালানির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেনি।

বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে তা রাশিয়ার উপর এক ধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি করে দেবে। কেননা শুধু রাশিয়ার প্রযুক্তি সহায়তাই নয়, বরং বিদ্যুৎকেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য যে কাঁচামাল দরকার হবে (ইউরেনিয়াম), তার সরবরাহ নিশ্চিত করার এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রের বর্জ্য নেয়ার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে সব সময় আমাদের সম্পর্ক ভালো রাখতে হবে। এমনকি আমাদের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে হলেও। এ প্রকল্প যতদিন চলবে ততদিন দুইটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা কি কেউ দিতে পারে?

তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতে পারে পানিতে যা মুহূর্তে গোটা দেশকে গ্রাস করবে

এই বর্জ্য নিষ্কাশনের সমস্যা ছাড়াও আর অনেক সমস্যা আছে। পারমাণবিক চুল্লিকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য তাকে ঘিরে ঠাণ্ডা পানির প্রবাহ চালানো হয় (জাপানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল ওই পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করার প্রযুক্তি বা কুলিং সিস্টেম অচল হয়ে পড়ায়)। জাপানের ফুকুশিমা ও আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ডের ঘটনায় আমরা জানি তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত পানি আশপাশের নদী-সাগরের পানির প্রবাহের সাথে মিশে বিস্তীর্ণ এলাকার, এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারের জনগণকেও বিরাট স্বাস্থ্যঝুঁকির মাঝে ফেলেছে। আমাদের এই নদীবহুল-পানিবহুল দেশে একটি ছোট ঘটনাই কি যথেষ্ট নয় সারাদেশের মানুষকে ক্যান্সারের ঝুঁকির মাঝে ঠেলে দিতে?

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বর্জ্যপদার্থ থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রাও খুব ভয়াবহ। বাংলাদেশে আমরা এই পারমাণবিক বর্জ্য পুঁতে রাখব কোথায়? ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশে এমন কোনো পরিত্যক্ত অঞ্চল নেই যেখানে আমরা পারমাণবিক বর্জ্য সরিয়ে রাখতে পারি। মাটির গভীরে পুঁতে রাখলে ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে যা আমাদের দেশে বিরাট বিপর্যয় নামিয়ে আনবে। ফলে পারমাণবিক বর্জ্য আমাদের ঘাড়ে এক বিরাট সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হবে। বলা হচ্ছে, রাশিয়া এই বর্জ্য বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু এ ধরনের কোনো সুনির্দিষ্ট চুক্তি এখনও স্বাক্ষর হয়নি।

সরকার কী বলছে?

এসব বিপদের কোনো কিছুকেই বিবেচনায় না নিয়ে সরকারের তরফ থেকে যে কথাটি বলা হচ্ছে তা হলো, রূপপুরে আনা হবে তৃতীয় প্রজন্মের রিঅ্যাক্টর, যা অত্যন্ত নিরাপদ। তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় দ্বিতীয় প্রজন্মের তুলনায় এতে দুটি বৈশিষ্ট্য উন্নত – এতে তেজস্ক্রিয়-দূষিত পানি বাইরে আসবে না, আর এর নিরাপত্তা বেষ্টনী অধিক পুরু স্টিলের তৈরি। এর ফলে খরচও বেড়ে যায় প্রায় চার গুণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এতসব জানার পরও জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকার মতো প্রযুক্তিতে উন্নত দেশ কেন নতুন পারমাণবিক চুল্লির বিষয়ে অনাগ্রহী?

ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীরা চতুর্থ প্রজন্মের প্রযুক্তির দিকে ধাবিত হচ্ছেন, এবং সেটা নিরাপত্তার কথা ভেবেই। যদি তৃতীয় প্রজন্মের প্ল্যান্ট যথেষ্ট নিরাপদ হতো তাহলে এতো দ্রুত কি বিজ্ঞানীরা তা পরিবর্তনের কথা ভাবতেন? বলা দরকার যে অতি উন্নতমানের ইউরেনিয়াম ব্যবহার না করলে তৃতীয় প্রজন্মের প্লান্টের কর্মদক্ষতা ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস পায়। এ কারণেই, রাশিয়া আমাদের কী মানের ইউরোনিয়াম দেবে তা খুবই সংশয়ের ব্যাপার। পণ্য বিক্রেতা সবসময়ই বিজ্ঞাপনে তার পণ্যের গুণাগুণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে, এমনকি যা নেই তাও প্রচার করে। কিন্তু ক্রেতাও যখন বিক্রেতার ভাষায়, বিজ্ঞাপনের ভাষায় কথা বলে তখন সত্য-মিথ্যা যাচাই করা সত্যিই দুরূহ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকা। কিন্তু সে ঝুঁকিকেও উড়িয়ে দিচ্ছেন সরকারের কর্তারা। তারা বলছেন যে, বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকিতে থাকলেও রূপপুর পরমাণু বিদ্যুকেন্দ্র রিখটার স্কেলে ১০ মাত্রার ভূমিকম্প সহ্য করার মতো করে তৈরি করা হবে। কিন্তু সমস্যাটা তো শুধু বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভূমিকম্প সহনক্ষমতার বিষয় নয়। বড় ধরনের ভূমিকম্পে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন উৎপন্ন তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। সেই পানির যোগান তখন কীভাবে মেটানো হবে? আর শুধু চুল্লি নয়, ভূমিকম্পের ফলে পরমাণু বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বড় দুর্যোগের জন্য আমরা সাধ্যমতো প্রস্তুতি নেব, কিন্তু যে প্রযুক্তি দুর্যোগের ফলে, যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনার ফলে বোমায় রূপান্তরিত হবার একাধিক নজির আছে, সেই প্রযুক্তি ঘরে তুলে আনার অর্থ কী?

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কি সস্তা?

এক সময় অনেকেই ভেবেছিল, পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে স্বল্প খরচে অফুরন্ত শক্তি উৎপাদনের চাবিকাঠিটা মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও সেদিন এ আবিষ্কারকে 'প্রাগৈতিহাসিক মানুষের প্রথম আগুন আবিষ্কারের পর সবচেয়ে বড় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। চল্লিশের দশক থেকেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরে এ তালিকায় যুক্ত হয় কানাডা, চীন, ভারত, পাকিস্তানসহ আরও অনেক দেশের নাম।

কিন্তু কিছুদিন পরেই এ উৎসাহে ভাটার টান লাগে। দেখা গেল, পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে তা ব্যবহারের মাত্রাও কমতে থাকে। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, একই ক্ষমতার একটা তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে প্রয়োজনীয় পুঁজির চেয়ে একটা পারমাণবিক বিদ্যুকেন্দ্র স্থাপনে প্রয়োজনীয় পুঁজির পরিমাণ আড়াই থেকে তিন গুণ বেশি। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ খরচও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। আবার একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে যত খরচ হয়, তার আয়ু শেষ হওয়ার পর তা নিরাপদে ভেঙে ফেলতে খরচ পড়ে নতুন চুল্লি বসানোর খরচের প্রায় সমান। অর্থাৎ খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। এখন কেউ যদি নিরাপত্তা ও ভাঙার খরচ বাদ দিয়ে শুধু নির্মাণ ব্যয়টাকেই দেখায় তাহলে সেটা হবে একটা নির্জলা মিথ্যাচার ও প্রতারণা।

এমনিতেই উচ্চমূল্যের এ পরমাণু বিদ্যুৎ আমাদের মতো দুর্নীতি-লুটপাটে আক্রান্ত দেশে আরও দামী হয়ে ওঠে। যেমনটা রূপপুরের ক্ষেত্রেও হয়েছে। এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার (প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা)। এরপর শোনা গেল এতে ব্যয় হবে ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি ডলার বা ২৪ হাজার থেকে ৩২ হাজার কোটি টাকা। আর নির্মাণ শুরু হওয়ার আগেই কয়েক ধাপে ব্যয় বাড়িয়ে এখন পর্যন্ত ব্যয় এসে ঠেকেছে ১২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১ লাখ ১ হাজার ২০০ কোটি টাকায়। এই ব্যয় কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা কে বলতে পারে?

পরমাণুর রাজনীতি : লুণ্ঠিত গ্যাস-কয়লা

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস-কয়লা-পানি-বায়ু প্রভৃতি বিপুল প্রাকৃতিক উৎস আমাদের দেশে আছে। এসব নিরাপদ পথ থাকতেও অনিরাপদ এবং ভয়ঙ্কর পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন কেন? তাও আবার পরের কাছ থেকে ধার করে? এর পেছনে একদিকে আছে শাসকদলের বাহবা নেয়ার প্রচেষ্টা। পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন তাদের কাছে নাকি প্রেস্টিজিয়াস ইস্যু! কিন্তু বিষয়টি আসলে প্রেস্টিজের নয়, ক্ষমতার। আওয়ামী লীগ দেশের জনগণের ওপর নির্ভর করে ক্ষমতায় নেই। তার প্রধান সহযোগী হলো দেশের বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতি শ্রেণি, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদী ভারত। আওয়ামী লীগের নানা সিদ্ধান্তে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ। তাকে মোকাবেলা করতে আওয়ামী মহাজোট বিশ্বের অপরাপর পরাশক্তি যথা রাশিয়া ও চীনকে হাতে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, প্রধানত রাশিয়াকে সন্তুষ্ট রাখতেই রূপপুর প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামও কেনা হয়েছে। একইভাবে চীনকে হাতে রাখার জন্যও নানা প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়ে রাশিয়াও আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্পে আগ্রহী হয়ে উঠেছে চীন।

এটাও সবার জানা পারমাণবিক বিদ্যুতের জন্য শুধু চুল্লি নয়, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম, এমনকি প্রকৌশলী-মিস্ত্রি সবকিছুই আমাদের আমদানি করতে হবে। ফলে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন বাবদ মন্ত্রী-আমলাসহ দেশের কর্তাদের পকেটে একটা মোটা অংকের কমিশন জমা হবে। এ কাজের কন্ট্রাকটের (ঠিকাদারি) সাথে যুক্ত থেকে বড় ব্যবসায়ীদেরও বেশ ভাল লাভই হবে।

শাঁখের করাতের নিচ থেকে বেরিয়ে আসুন

বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী শাঁখের করাতের মতো জনগণকে কাটছে। একবার দেশের গ্যাস-কয়লা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিয়ে, আরেকবার বিদ্যুৎ-জ্বালানি সংকটের কথা বলে সুন্দরবন বিনাশী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কিংবা দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে।

আমরা বিজ্ঞানের অন্য যেকোনো আবিষ্কারের মতো পরমাণু শক্তির ব্যবহারের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু এর জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, দক্ষতা-অভিজ্ঞতা ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আয়ত্ত করা ছাড়া ব্যবহারের যে ঝুঁকি রয়েছে তা এড়ানোর পক্ষে। সাথে সাথে পরমাণু শক্তির ব্যবহার নিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর যে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা আছে তার কবল থেকে মুক্ত থাকার পক্ষে।

রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধনের সময় থেকে বাংলাদেশে একটা স্লোগান আমরা শুনলাম – 'পারমাণবিক যুগে বাংলাদেশ'। এই স্লোগান লেখা বিলবোর্ডে গোটা ঢাকা শহর ছেয়ে গেল। পাবনা শহরসহ রূপপুরকেও সাজানো হয়েছিল। কিন্তু এই সাজ সাজ রব আর স্লোগান আমাদের কী দেবে? বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে বলেও তো অনেক ঢাক-ঢোল পেটানো হয়েছে। কিন্তু সেই ঢাকের শব্দ কি দেশের গরিব শ্রমিক কৃষক সীমিত আয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেছে? বরং প্রতিদিন চালের দাম, পেঁয়াজের দাম, বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কারণে মানুষের আহাজারি কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। মালিকগোষ্ঠীর খাই মেটাতে আর শাসকদের 'প্রেস্টিজ' উঁচু করতে যে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র আমাদের উপর চাপানো হলো, তার দায় কারা বহন করবে?

কী পেল দেশের মানুষ?

(১ম পৃষ্ঠার পর) থাকবে না। সবাই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ পাবে। স্বাধীনতার ৪৬ বছরে তাদের সে স্বপ্ন কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে?

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা – স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি সেই আকাঙ্ক্ষার বিপরীতেই দেশ পরিচালিত হয়েছে। সমাজের কোনো স্তরেই গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার তো হয়ইনি বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের শাসক নির্বাচনের যে পদ্ধতি প্রচলিত বর্তমানে আওয়ামী লীগের শাসনামলে তাও ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। 'কম গণতন্ত্র, বেশি উন্নয়ন' স্লোগান তুলে আওয়ামী লীগ সরকার পাকিস্তান আমলের আইয়ুবী স্বৈরাচারী ব্যবস্থার নতুন সংস্করণ চালু করেছে। জেনারেল এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনামলেও এই উন্নয়নের স্লোগান আমরা শুনেছি। যে কোনো স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুলিয়ে রাখার মন্ত্র হিসেবে এই উন্নয়নের স্লোগান একটি চটকদার বিজ্ঞাপন মাত্র। এতে বড় বড় তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হয়। আওয়ামী লীগ সরকারও পদ্মাসেতু, ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বড় বড় প্রকল্প নিয়ে জনগণকে বোঝাতে চাইছে দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। সত্যিই কি তাই? তাহলে উন্নয়ন বলতে আমরা কী বুঝবো? গণতন্ত্র বিসর্জন দেওয়াও কি উন্নয়নের লক্ষণ?

উন্নয়ন কখনো গণতন্ত্রের বিকল্প হতে পারে না। দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানি স্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে প্রত্যাখান করে এদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কারণ স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার, চাওয়া-পাওয়ার প্রতিফলন ঘটে না। ক্ষমতার সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয়দের স্বার্থ রক্ষিত হয়। সেই ধারাতে পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল ২২ পরিবার। যারা দেশের অর্থনীতি-রাজনীতি সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির প্রত্যয়েই জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। দেশ স্বাধীন করেছিল। স্বাধীন দেশেও কয়েক দফা সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায়। সেই আকাঙ্ক্ষার সুযোগ নিয়ে এখন আওয়ামী লীগ সরকার সংসদীয় স্বৈরাচারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ফলে শাসন পদ্ধতির দিক থেকে দেখতে গেলে এটা স্পষ্টতই পশ্চাদপসরণ, অগ্রগমন নয়।

একইভাবে উন্নয়ন মানে একটি দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদের পুঞ্জীভবন ও প্রবৃদ্ধি নয়, দেশের মানুষের সামগ্রিক জীবনমানের ও জীবনযাত্রার উন্নয়ন। সেই নিরিখে এদেশের মানুষের জীবনমানের কতটুকু উন্নতি হয়েছে? পরাধীন দেশে ছিল ২২ পরিবারের রাজত্ব। আর স্বাধীন দেশে তার স্থলে গজিয়েছে ৫০ হাজার কোটিপতি। আয়কর জমা দেয়ার নিরিখে এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব। সম্পদের পরিমাণ গোপনীয় রাখার প্রবণতা হিসাব করলে এই সংখ্যা বাস্তবে আরও বেশি হবে। এদের হাতে কোটি টাকা থেকে শুরু করে হাজার হাজার কোটি টাকা জমা হয়ে আছে। এইভাবে গত ৪৬ বছরে একদিকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ গড়ে তুলেছে বৈভবের পাহাড়। অন্যদিকে ৪ কোটি মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। জনসংখ্যার ২৫ ভাগ মানুষ তিনবেলা খেতে পায় না – কোনো রকমে খেয়ে না খেয়ে জীবন ধারণ করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের থাকার কোনো জায়গা নেই। উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকা শহরের ফুটপাতে খোলা আকাশের নীচে রাত্রিযাপন ও মানবেতর জীবনযাপন করছে। এইসব মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সরকারি 'উন্নয়নে'র পরিসংখ্যানে এইসব মানুষের ঠাঁই নেই। তাহলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সত্যিকারের চিত্র কী?

নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সাধারণ আয়ের মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ডাল-ভাত জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে। এই অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। চালের মূল্য অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। এক কেজি মোটা চালও ৫০ থেকে ৬০ টাকায় ক্রয় করতে হচ্ছে। পেঁয়াজের কেজি ১০০ টাকা ছুঁয়েছে। এই সরকারের দু'বারের মেয়াদে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ৮ বার। গ্যাসের মূল্য ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বেড়েছে গাড়ি ভাড়া-বাড়ি ভাড়াসহ সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'নাম্বিও'র জীবনযাত্রার একটি সূচক প্রকাশ করেছে। যেখানে দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ায় জীবনযাত্রার খরচ সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত একবছরে পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়েছে শতকরা ১২.১৭ শতাংশ, বাড়ি ভাড়া বেড়েছে ২২ শতাংশ। কিন্তু মানুষের আয় কি বেড়েছে এই হারে?

অথচ প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, প্রবৃদ্ধি বাড়ছে বলে সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা যে গলা ফাটায় – সেই প্রবৃদ্ধি অর্জনেও এদের ভূমিকাই প্রধান। কিন্তু প্রবৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি?

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থেকে গত কয়েক বছরে অর্থ লোপাটের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। শুধু এক বেসিক ব্যাংক থেকেই লুট হয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। খেলাপি ঋণ বাড়ছে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮০ হাজার ৩০৭ কোটি টাকা। । মনে আছে – কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পারায় একজন মুক্তিযোদ্ধাকে কীভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল? অথচ বড় বড় রাঘব বোয়ালরা যখন নানা অছিলায় ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করছে তখন সরকারের টুঁ শব্দটিও নেই। শুধু খেলাপি ঋণ নয় বাড়ছে জাতীয় ঋণ বা মাথা পিছু ঋণের পরিমাণও। এদেশে একজন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় ৪০ হাজার টাকা ঋণের বোঝা নিয়ে। জাতীয় ঋণের পরিমাণ অর্থবছর শেষে দাঁড়াবে ৭ লাখ ৬১ হাজার ৯৩০ কোটি টাকা। যা মোট জিডিপি'র ৩৪.৫ শতাংশ। আর মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৬ হাজার টাকায়। অনেকের বার্ষিক আয়ের থেকেও যা বেশি। অথচ মাথাপিছু আয় বাড়ছে, দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হচ্ছে – এই নিয়ে কত উচ্চবাচ্য সরকারের। কিন্তু আমরা জানি ৪ কোটি মানুষ এখনো দৈনিক ১ ডলারও আয় করতে পারে না।

জনগণের মেহনতের টাকায় হরিলুট তো চলছেই। সেই সাথে চলছে প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন। খাল-বিল-নদ-নদী-বন সবর্ত্র ভূমিদস্যুদের আগ্রাসন। আর মাটির নীচে যে প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস-কয়লা – এগুলোও বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারা দিয়ে দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দিচ্ছে সরকার। সেই গ্যাস আবার বর্ধিত দামে কিনছে। এই কেনা-বেচার প্রক্রিয়ায় জনগণের টাকা চলে যাচ্ছে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী শ্রেণির হাতে। তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোগে। যার উৎপাদন খরচ ৮ থেকে ৯ গুণ বেশি। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা যায়, দেশে বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর নিট মুনাফার গড় পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত। যা প্রতিবেশী ভারতে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলেও দেশে সরকার তেলের দাম কমাচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় কোম্পানি পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনও এই খাত থেকে লাভ করছে। গত বছরেই লাভ করেছে ৭ হাজার ৩৩৪ কোটি ১৩ লাখ টাকা।

লুটপাট-চুরি-দুর্নীতি বিভিন্ন পন্থায় ৪৬ বছরে এক শ্রেণির মানুষ বিপুল বৈভবের মালিক হয়েছে। কিন্তু দেশে শিল্পায়ন হচ্ছে না। দেশে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমতে থাকায় মালিকরা শিল্পে বিনোয়োগে উৎসাহী নয়। ফলে মালিকের স্বার্থরক্ষক সরকার মানুষের মৌলিক অধিকার শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সেবাখাতে বিনিয়োগের সুযোগ করে দিচ্ছে। তাই শিক্ষা-স্বাস্থ্যও আজ কেনা-বেচার পণ্যে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার এত বছরেও সর্বজনীন শিক্ষার ধারণা একটা ফাঁকা বুলি হয়ে আছে মাত্র। ইউনেস্কোর তথ্যমতে, দেশে শিক্ষার হার এখনো ৪৭.৫০ শতাংশ। যারা শিক্ষাঙ্গনে যাবার সুযোগ পায় অর্থের অভাবে বড় একটা অংশ নানা স্তরে ঝরে যায়। ঝরে পড়ার হার রোধে সরকারের কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। বর্তমানে বাজেটের আকার বাড়লেও বরাদ্দ কমতে কমতে দাড়িয়েছে ৫.৭৮ ভাগ। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা। দেশে ৫০ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা সুবিধা বঞ্চিত। অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

উন্নয়ন হচ্ছে কার?

'টিফিনের সময় পেডে খিদা লাগে, তখন পড়ালেখা ভাল্লাগে না। খেলাধুলা কইরা পেট ভইরা কলের পানি খাই' – খাবারের কষ্টের কথাগুলো বলছিল সুনামগঞ্জের খাগাউড়া কান্দাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী প্রাপ্তি সরকার। এবারের বন্যায় তাদের ভিটে-মাটি সব বানের জলে ভেসে গেছে। শেরপুরে কোরবান আলীর মেয়ে কণিকা ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে গত ২৬ অক্টোবর। তার পরিবারের এতই অভাব যে লাশ সৎকারের খরচও এলাকার লোকজন চাঁদা তুলে দিয়েছে। মুন্সিগঞ্জেও একই পরিবারের তিনজন দিনের পর দিন খাবারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের ৭ জেলার অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে।

উপরে উল্লেখিত তথ্যগুলো কারও কাছে ভুল মনে হতে পারে। কেননা ঢাকা শহরে, বিভিন্ন শহরে চোখ মেলে তাকালেই দেখা যাবে সারি সারি সুউচ্চ অট্টালিকা, কোটি টাকার বিলাসবহুল প্রাইভেট কার আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান! সরকার বলছে দেশ চলছে এখন 'উন্নয়নের মহাসড়কে'। মন্ত্রী-এমপিরা দিন রাত উন্নয়নের গল্প শুনিয়েই যাচ্ছেন। একটি স্লোগানও প্রায়ই দেখা যায় – 'উন্নয়নের গণতন্ত্র-শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র।' কিন্তু সেই উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া কণিকা তার জীবনে খুঁজে পায়নি। ১২ বছরের শিশুটি জীবন বোঝেনি, অভাবের তীব্রতা বুঝেছে। জীবনের স্নেহময় সান্নিধ্য পাবার আগেই তার জীবন প্রদীপ নিভে গেছে। প্রশ্ন ওঠা তাই স্বাভাবিক – উন্নয়ন তাহলে হচ্ছে কার?

বাংলাদেশে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় বাড়ছে। কীভাবে বাড়ছে? জিডিপি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পিছনে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো টাকার বড় ভূমিকা আছে। ভূমিকা আছে গার্মেন্টস আর কৃষি খাতেরও। বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমেরও মূল্য কম নয়। কিন্তু এখানেও একটা দারুণ বৈপরীত্য! যারা এই সম্পদ সৃষ্টি করছে তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা দুটোই খুব তীব্র। প্রায় প্রতিদিনই বিদেশ থেকে শ্রমিকের লাশ আসে, দেশে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হয়ে, আগুনে সেদ্ধ হয়ে শ্রমিক মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে রাস্তায় ফসল আর চোখের জল ফেলে। বোঝাই যায়,সরকার যে উন্নয়নের গল্প বলে সেটা আসলে এই শ্রমিক-কৃষকদেরই রক্ত নিংড়ানো শ্রমের ফল।

বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ১৬০২ মার্কিন ডলার। এই হিসাবের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। কিন্তু এই হিসাবের মধ্যে একটা ফাঁকি আছে। আফ্রিকার বহু দেশ মাথাপিছু আয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে কিন্তু সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান বাংলাদেশের চেয়ে নিম্ন। যেমন নাইজেরিয়ার মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের দ্বিগুণেরও বেশি। কিন্তু তাতে তাদের জীবনযাত্রার মান বাংলাদেশের চেয়ে ভালো তা বলা যাবে না। অর্থাৎ দেখতে হবে মাথাপিছু আয়ের সাথে সাথে জীবন যাত্রার মান কতটুকু উন্নত হলো। মাথাপিছু আয়ের হিসাবটা একটু ভালো করে বোঝা দরকার। ধরা যাক, একটি পরিবার যদি ১ কোটি টাকা আয় করে আর আরেকটি পরিবার যদি ১০ হাজার টাকা আয় করে তবে উভয় পরিবারের গড় আয় হবে ৫০ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। এতে কি দুই পরিবারের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে? একইভাবে ১৬০২ মার্কিন ডলার মাথাপিছু আয় ধরে চার সদস্যের একটি পরিবারের বার্ষিক গড় আয় হয় প্রায় ৬.৫ হাজার মার্কিন ডলার অর্থাৎ মাসে প্রায় ৫২ হাজার টাকা। বাংলাদেশে কয়টি পরিবার মাসে ৫২ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারে? পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে শতকরা ৮০টি পরিবারের গড় মাসিক আয় ১০ হাজার টাকারও নিচে।

তাহলে খাতা-কলমে জিডিপি, মাথাপিছু আয়ের এই বাড়তি হিসাব আসে কীভাবে? এখানেই লুকিয়ে আছে মূল সত্যটা। দুর্নীতি-লুটপাট করে সম্পদের বিপুল বৃদ্ধি জিডিপি ফুলে ফেপে উঠতে ভূমিকা রাখে। চুরি করে, অপচয় করে বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের ব্যয় বাড়িয়েও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অবয়ব বড় দেখানো যায়, এতেও জিডিপি বাড়ে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসনের ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ ঘটলেও কিছু মানুষের হাতে সম্পদ জমে, তাতেও জিডিপি বাড়ে। তাই কেবল জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিমাপ করলে মূল উন্নয়নের কথাটা আড়ালে পড়ে যায়।

সত্য কথাটি হলো, সরকারের উন্নয়নের গল্পটা দেশের মুষ্টিমেয় ধনীদের জন্য প্রযোজ্য। এ চিত্র আজ কেবল বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বেই একই পরিস্থিতি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অক্সফাম বলছে, পৃথিবীর শীর্ষ ৮ জন ধনীর হাতে বিশ্বের অর্ধেক মানুষের সমান সম্পদ আছে। কী ভয়াবহ বৈষম্য! উন্নত প্রযুক্তি আসছে বাজারে। কিন্তু তা ব্যবহৃত হচ্ছে শ্রম শোষণে, বাড়িয়ে দিচ্ছে বেকারত্ব। বোঝাই যাচ্ছে 'উন্নয়ন' কথাটির কোনো একক অর্থ নেই। উন্নয়ন যদি বেশিরভাগ মানুষের বঞ্চনা আর বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়, জীবনে অনিশ্চিয়তা নিয়ে আসে, তবে সেই উন্নয়ন এক বিভীষিকার নাম। 'উন্নয়ন' যদি কারও কাছে অঢেল বিত্ত বৈভব তৈরির উপায় হয়, তবে অনেকের কাছে তা আতঙ্কের প্রতিশব্দ।

তাহলে মানুষ যাবে কোথায়? তাই বিক্ষোভ চলছে, আমেরিকা থেকে ইউরোপ; এশিয়া থেকে আফ্রিকা। সবখানেই আওয়াজ উঠছে - এই বৈষম্যের সমাজ ভাঙতে হবে। এমন পরিস্থিতির কথা বহু আগেই বলেছিলেন মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস। বাতলে দিয়েছিলেন মুক্তির পথও। সেই পথ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনের পথ। একমাত্র সমাজতন্ত্রেই ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর হয়, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা সৃষ্টি হয়। তেমন একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হলে আজ বাংলাদেশের শ্রমজীবী-নিপীড়িত মানুষকেও লড়াই করতে হবে। উন্নয়নের রঙিন ফানুস দিয়ে যে মানুষের কষ্ট-যন্ত্রণাকে চাপা দেয়া যায় না, তা আজ স্পষ্ট।

দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ধর্মকে পৃথক করে। ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়া, সাম্রাজ্যবাদী রূপ ধারণ করায় তা আর অগ্রসর করতে পারেনি। বরং ধর্মকে কেন্দ্র করে জাত-পাত-বর্ণ-গোত্র নানাভাবে মানুষকে বিভক্ত করে তুলেছে।

সাধারণভাবে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের কাছে ধর্মের রূপ আর কোনো ধর্ম কিংবা তার কোনো ধারা-উপধারার উপর ভিত্তি করে কোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক তৎপরতা এক কথা নয়। কোনো ব্যক্তি-গোষ্ঠী-সংগঠন যখন ধর্মের মৌল আদর্শ নিজেদের মতো সংজ্ঞায়িত করে এবং অন্যের মত বিশ্বাস চর্চাকে অস্বীকার করে তা বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে, তখন তা তৈরি করে সহিংস পরিস্থিতি। জোর করে চাপানোর এই মতাদর্শিক পরিস্থিতিই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাজনীতির জন্ম দেয়। ভারতে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি-শিবসেনা-আরএসএস'র সৈনিকরা কী না করছে! মূখ্যমন্ত্রী থাকাকালে গুজরাটে মোদি মুসলিম নিধনে কসাইগিরি করেছেন। আর এখন তো সে-ই দেশের প্রধানমন্ত্রী। এই ধর্মাশ্রয়ী শাসকদের মধ্যে কোথায় রামকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, বিবেকানন্দের ধর্মবোধ! অসংখ্য ধর্মপ্রচারক শান্তির (ইসলাম) বাণী নিয়ে যে মধ্যপ্রাচ্যে এসেছিলেন, আজ সেখানে শিয়া-সুন্নিসহ অসংখ্য মাজহাবে (গোত্রে) বিভক্ত হয়ে প্রতিদিনই সহিংসতা চলছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে, ক্ষমতা ও ভোটের রাজনীতির প্রয়োজনে ধর্মীয় বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ধর্মকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে, আপোষ করছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই ধর্মীয় সন্ত্রাসের চাষ করছে

তালেবান, আলকায়েদা, আইসিসসহ যেসব সন্ত্রাসী জঙ্গীগোষ্ঠীকে দমন করার কথা বলে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে দখলদারিত্বের জাল ফেলেছে তারা সবাই মার্কিন সৃষ্ট, তাদেরই লালিত-পালিত দানব। আগাগোড়া ধর্মীয় বিভিন্ন সন্ত্রাসী-জঙ্গী গোষ্ঠী-সংগঠন তৈরিতে কারিগরের ভূমিকা পালন করেছে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী তার নিজস্ব স্বার্থেই। উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে খুঁটি ধরে রাখতে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তৈরি করে সমাজতন্ত্র ও দেশে দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। আফগানিস্তানের নজিবুল্লাহ্ সরকারকে উৎখাত করার জন্য প্রশিক্ষণ, অর্থ, অস্ত্রসহ সব রকম পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে মুজাহেদিন বাহিনী তৈরি করে। ইউএসএইড'কে দিয়ে শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সব স্তরেই সরবরাহ করে ধর্মীয় উন্মাদনার বই-পুস্তক। যে বইয়ে সোভিয়েত সৈন্যের চোখ উপড়ে ফেললে পুরস্কার হিসেবে বেহেশতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। মার্কিন গোয়েন্দা সংগঠন সিআইএ সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকেও মাঠের কাজে লাগায়। মুজাহেদিনের পর আবার সন্ত্রাস-সহিংসতা জারি রাখতে তাদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে তালেবান। সোভিয়েত প্রভাবের বিরুদ্ধে আশির দশকে যে সমস্ত ইসলামী সশস্ত্র সংগঠনের সাথে ঐক্য হয় পরবর্তীতে তাদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। সারা দুনিয়া বর্তমানে এদের বিষময়তায় আক্রান্ত। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর শত্রুপক্ষ বদলে যায়। ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে নিজেই জন্ম দিয়ে তার বিরুদ্ধে কথিত লড়াইকে একটি বৈশ্বিক এজেন্ডা হিসেবে জায়েজ করে নেয়।

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নেপথ্যে তেল আর অস্ত্রের ব্যবসা

১৯৯৭ সালের ২৪ মে তালেবানরা আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করে। আর ঠিক তার আগের দিন মার্কিন পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল তার সম্পাদকীয়তে লেখে, "আফগানিস্তান হচ্ছে মধ্য এশিয়ার তেল, গ্যাস ও অন্যান্য গ্যাস রপ্তানির প্রধান পথ। ... তাদের পছন্দ করো বা না করো, ইতিহাসের এই পর্যায়ে তালেবানরাই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সবচাইতে উপযুক্ত।" এর এক দিন পর যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস বলে- "ক্লিনটন প্রশাসন মনে করে যে তালেবানদের বিজয় ইরানের পাল্টা শক্তি হিসেবে দাঁড়াবে। ...এমন একটি বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত করবে, যা এই অঞ্চলে ইরান ও রাশিয়ার প্রভাবকে দুর্বল করবে"। মার্কিন তেল কোম্পানি ইউনোকল ক্লিনটন প্রশাসন ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বক্তব্যকে 'খুবই ইতিবাচক' অগ্রগতি বলে অভিহিত করে। ঐ বছরেই যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিকভাবে শক্তিশালী ও আক্রমণাত্মক করার জন্য 'প্রজেক্ট নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি' নেয়া হয়। এতে স্বাক্ষর করেন ডিক চিনি, রামসফেল্ড, জেব বুশ, ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা প্রমুখ তেল ও অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। প্রাকৃতিকভাবে পুরো মধ্যপ্রাচ্য তেল সম্পদে সমৃদ্ধ। পৃথিবীর প্রমাণিত মজুদের বেশিরভাগ পরিমাণ এই অঞ্চলে। একদিকে মুসলিম রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা অন্যদিকে জায়নবাদী ইসরায়েলকে পৃষ্ঠপোষকতা করার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ ভৌগোলিক অঞ্চল করায়ত্ত করে রেখেছে। সন্ত্রাসী-জঙ্গী গোষ্ঠীকে অস্ত্র সরবরাহ, যুদ্ধ, যুদ্ধভাব জিইয়ে রেখে চলছে রমরমা অস্ত্র ব্যবসা তথা অর্থনীতির সামরিকীকরণ। সর্বশেষ জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ইহুদি জায়নবাদী ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়েছে আর ফিলিস্তিনি হামাস জিহাদের ঘোষণা দিয়েছে।

গণআন্দোলনের বিকল্প নেই

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ১১ গৃহকর মওকুফ করার কথা উল্টো বাড়িয়ে দিচ্ছে! ৬০ লক্ষ চট্টগ্রামবাসীর এই সংকট মুহূর্তে একদল মানুষ এগিয়ে আসে, এই অন্যায়-অন্যায্য-অযৌক্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স বাতিলের দাবিতে। গঠিত হয় 'করদাতা সুরক্ষা পরিষদ'।গত বছর নভেম্বর মাস থেকে টানা ১২ মাস ধারাবাহিকভাবে এই কমিটি আন্দোলন পরিচালনা করে।

কদমতলীর অধিবাসী নুরুল আফসারের নেতৃত্বে 'চট্টগ্রাম করদাতা সুরক্ষা পরিষদ'র নামে শুরু হয় এই আন্দোলন। শুরুতে মানব বন্ধন, মিছিল, প্রেস কনফারেন্স, সমাবেশ করা হয়। প্রথমদিকে জনগণ বুঝতে না পারলেও যখন বাড়ির অ্যাসেসমেন্ট শুরু হয়, তখন তাদের ক্ষোভ দানা বেধে উঠে। আস্তে আস্তে শুরু হয় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বৈঠক, স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচী, সমাবেশ ও মিছিল। একই দিনে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের স্মারকলিপি পেশ। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়, হতাশা নিয়েও আসতে থাকে জনগণ। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা। গঠিত হয় ওয়ার্ডভিত্তিক জনগণের সম্মিলিত জোট।

অন্যদিকে এই গলাকাটা হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপের হোতা মেয়র আ জ ম নাসির করদাতা সুরক্ষা পরিষদের সাথে মতবিনিময় করার নামে বাস্তবে ভয় ভীতি দেখায় যেন আন্দোলনের পথ থেকে সরে যায়। আপিলের ব্যবস্থা করে ৭০/৮০ ভাগ কর ছাড় দেয়া শুরু হয়। যেন জনগণ আন্দোলনে না যায়। পত্রিকায় এসেছে অ্যাসেসমেন্ট এর নাম করে প্রায় কোটি টাকার ঘুষ বাণিজ্য হয়েছে। এক পর্যায়ে আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করার হুমকি দেন মেয়র! কিন্তু নেতৃবৃন্দ অবিচল থাকেন তাদের আন্দোলনের পথে। ১৯৮৬ সালে স্বৈরাচারী এরশাদের তৈরি করা গৃহকরের এই আইন বাতিলের দাবিতে জোয়ার ওঠে চট্টগ্রামে।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পিইসি পরীক্ষা বাতিল হচ্ছে না

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হার কমছে, সব শিশু একটি সার্টিফিকেট পাচ্ছে, পাশের হার বাড়ছে ইত্যাদি। সুতরাং এই পরীক্ষা বন্ধ করা যাবে না।' সরকার আর জনগণের চাওয়া সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। কোনো উপায় না পেয়ে অভিভাবকদের একটি অংশ যখন পরীক্ষা বন্ধে হাইকোর্টে রিট করেছে, তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী একটু যেন ধমকের স্বরেই বলেছেন 'পিইসি-জেএসসি পরীক্ষার মতো খুচরা বিষয় নিয়ে আদালতের সময় কাটানো কেন?' যে ঘটনায় শিশুদের ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন, জনগণের জীবন ওষ্ঠাগত, প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেটা 'খুচরো বিষয়'!

অথচ এই পরীক্ষা চালু হবার পর থেকে শিশুরা কী ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে! পত্রিকায় এসেছে একজন অভিভাবকের কাতরোক্তি – 'পিইসি শিশুদের উপর মারাত্মক মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার। ১২-১৪ টা বই আর এত পড়াশুনা, এটা অমানবিক। স্কুলের চাপ, কোচিংয়ের চাপ, তারপর আবার প্রাইভেট। সবমিলিয়ে এগুলো শিশুদের উপর চূড়ান্ত নির্যাতনের শামিল। সরকার এ পরীক্ষা চালু করার ফলে স্কুলগুলো হয়ে গেছে সব ব্যবসাখানা। আজ এই মডেল টেস্ট, কালকে এই টিউটোরিয়াল, পরশু আরেক পরীক্ষা। বাচ্চাদের পড়ার সুযোগ না দিয়ে কেবল পরীক্ষা।' সরকার যাকে বলছে 'পরীক্ষা উৎসব' – এই হলো তার অবস্থা।

পরীক্ষা মানে যদি মূল্যায়ন হয়, তবে তাকে এমন জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য কী? মূল্যায়ন তো শ্রেণি কক্ষেও হতে পারে। সরকার কথায় কথায় যে ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দেয় সেখানেও শিশু বয়সে এই ধরনের পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। মাধ্যমিক স্তরে ওঠার আগ পর্যন্ত শিশুদের পড়াশুনা, খেলাধুলা সবকিছু স্কুলেই। 'হোমওয়ার্ক' বলতে সামান্য কিছু বাড়িতে করতে হয়। শিশুরা খেলতে খেলতে, একসাথে থাকার মাধ্যমে, পরিবেশের মধ্যে অনেক কিছু শেখে। জাতীয় পর্যায়ের একটি পরীক্ষা যদি তাকে দিতেই হয় তবে সেটা তো একটা পরিপক্বতা আসলেই কেবল নেয়া প্রয়োজন।

তবুও কেন এই পরীক্ষা চালু রাখা হয়েছে? এখানে সরকারের কিছু উদ্দেশ্য আছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এবং 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ঘোষণা ছিল। কিন্তু সরকার আজও 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়ন করতে পারেনি। অব্যাহত প্রশ্নফাঁস, উত্তর বলে দেয়া, মূল্যায়নে কারচুপি করেও সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করানো যায়নি। একইভাবে অর্থনৈতিক নানা বৈষম্যের কারণেও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশুদের ঝরে পড়া ঠেকানো যাচ্ছে না। পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উঠতে উঠতে প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিশু ঝরে যায়। এই ঝরে যাওয়া শিশুদের ধরে রাখার ক্ষমতা সরকারের নেই। সেটা করতে হলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিলোপ ঘটাতে হবে। তা না করে ঝরে যাওয়া শিশুদের রক্ষা করা যাবে না, এমডিজিও অর্জিত হবে না। এমডিজি অর্জিত না হলে মধ্যম আয়ের তকমা বা আরও কিছু তথাকথিত গৌরবের পালক যুক্ত হবে না। তাই সরকারের প্রয়োজন হলো পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পিইসি বহাল রেখে লোক দেখানো সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

এখানে অর্থনৈতিক স্বার্থটিও গুরুত্বপূর্ণ। সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে নিজের উদ্যোগে স্কুল নির্মাণ করেনি। কেবল আগের প্রতিষ্ঠিত কিছু স্কুল জাতীয়করণ করেছে। এর বাইরে লক্ষ লক্ষ শিশুর পড়ার জন্য তৈরি হয়েছে বেসরকারি স্কুল-কিন্ডারগার্টেন-ক্যাডেট ইত্যাদি। যত বেশি স্কুল তত বেশি বাণিজ্য; যত বেশি কাঠামোগত পরিবর্তন; তত বেশি বাণিজ্য। শুধু তাই নয়, পিইসি-জেএসসি পরীক্ষা চালু হবার মাধ্যমে গাইড বই ও কোচিং ব্যবসা এখন রমরমা। যদি প্রায় ৩০ লক্ষ শিশু প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা দেয়, এদের অধিকাংশই যদি একাধিক গাইড বই কেনে, গড়ে যদি ১টা গাইডও সবাই কেনে, তার দাম যদি হয় গড়ে ৫০০ টাকা, তবে এখান থেকে ব্যবসা হয় প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা। আবার প্রতিটি শিশু কোচিং করতে বাধ্য হয়েছে। মাসে ৫০০ টাকা করে হলেও ১০ মাসে প্রতিটি শিক্ষার্থী ৫০০০ টাকা খরচ করেছে। তাহলে কোচিং খাতে বাণিজ্য হয়েছে প্রায় ১৭৫০ কোটি টাকা। হিসাবটি হয়তো পুঙ্খানুপুঙ্খ নয়, তবুও বোঝা যায় শুধু প্রাথমিক শিক্ষাতেই কীভাবে কোটি কোটি টাকার শিক্ষা ব্যবসা চলছে। জিপিএ-৫ পাবার মোহ শিক্ষাব্যবসাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। যেভাবেই হোক জিপিএ-৫ পেলেই যেন জীবন বর্তে যাবে – এই সবার মনোবাসনা। শাসকরাও বোঝাতে চায়, শিক্ষা মানে ডিগ্রি বা পরীক্ষার ফল। কিন্তু শিক্ষা মানে ডিগ্রি নয়, শিক্ষা জ্ঞানচর্চার ভিত্তি তৈরি করে, জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে চিন্তা, মনন ও মানসে উন্নত জীবন গঠনে সহায়তা করে। অনুশীলন করে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ডিগ্রি অর্জন হলো এই জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন ধাপে পৌঁছানোর স্বীকৃতি। কিন্তু আজ জ্ঞানশূন্য ডিগ্রি অর্জনই হয়ে যাচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। সে কারণে উচ্চডিগ্রিধারী অশিক্ষিত মানুষে দেশ ভরে যাচ্ছে, নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষরাই করছে চরম লঙ্ঘন। ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরীক্ষা। পরীক্ষা মানে একটি সার্টিফিকেট, যেটাকে কখনো একজন অভিভাবকও মনে করে তার শিশুর অর্জন। কিন্তু এসব করে আমরা তাদের শিক্ষিত মানুষ তৈরি করছি না, তৈরি করছি পরীক্ষার্থী। এর কি দীর্ঘমেয়াদী কোনো ফলাফল নেই?

এভাবে রিলে রেসের ঘোড়া হয়ে ছুটতে ছুটতে কী পরিণতি হচ্ছে আমাদের? এমন ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন চাপের কারণে শিশুর নিজের এবং তার অভিভাবকের সাথে চিত্তের সম্পর্কই স্থাপিত হয় না। মন মরে যায়, শিশুর প্রবণতা কীসে তা অভিভাবকও বোঝেন না। একজন পরীক্ষার্থীও এভাবে পরীক্ষার চাপে পড়ে পড়ে হাপিয়ে ওঠে। পড়াশুনা হয়ে ওঠে বোঝা, ছাত্রত্ব পরিণত হয় দাসত্বে। কত দ্রুত পড়াশুনা শেষ করা যায়, এ থাকে লক্ষ্য। এক ক্লাসের পড়াশুনা আরেক ক্লাসে মনে রাখার প্রয়োজন হয় না। কেননা পড়াশুনা তো আনন্দের খোরাক নয়, কেবল মুখস্থের বোঝা। কবিতা যখন কেবল মুখস্থ করে পরীক্ষায় উগড়ে দেবার বিষয় হয়, তখন তা আবেগ সৃষ্টি করতে পারে না। উদ্ভিদবিজ্ঞান যখন কেবল গাছের নাম, বিজ্ঞানবিষয়ক কিছু তথ্য মনে রাখার বিষয়, তখন সেই জ্ঞান গাছ-পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে না। বিজ্ঞানের পড়া যখন পরীক্ষায় লেখার বাইরেও নিজে কিছু আবিষ্কারের মন তৈরি করে না, তখন তা অর্থহীন কিছু সূত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। মাটি, গাছ. ফুল, ফল, জলবায়ু, পরিবেশ, সমাজ সবকিছু বোঝার মধ্যেই থাকে মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার শর্ত। এসবের সাথে যদি জীবনের যোগ না ঘটে তবে শিক্ষিত মানুষ হওয়া বলে না।

শাসকদের একটা লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষে-উদ্দেশ্যে তারা দেশ পরিচালনা করে, দেশের মানুষের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যেই পিইসি পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। সরকার তার স্বার্থে যা চাইছে তা এদেশের জনগণের স্বার্থের বিপরীত। সেক্ষেত্রে জনগণের কী করা উচিত? যে পরীক্ষা স্পষ্টভাবেই এদেশের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে নামা ছাড়া আর কি কোনো গত্যন্তর আছে?

তথ্যসূত্র :

১. যে কারণে পিইসি বাতিল করা যাচ্ছে না – রাখাল রাহা
২. হা শিক্ষা, হা পরীক্ষা - আবুল মোমেন

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শততম বার্ষিকী ও বাসদ (মার্কসবাদী)'র ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

গাইবান্ধা: রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শততম বার্ষিকী ও বাসদ (মার্কসবাদী)'র ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গাইবান্ধা স্বাধীনতা বিজয় স্তম্ভ প্রাঙ্গণে বুধবার বিকেলে জেলা শাখার উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আহসানুল হাবীব সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বক্তব্য রাখেন জেলা সদস্য সচিব মনজুর আলম মিঠু, সুন্দরগঞ্জ উপজেলা আহবায়ক বীরেন চন্দ্র শীল, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর কৃষকফ্রন্ট নেতা প্রভাষক গোলাম সাদেক লেবু, বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র জেলা সভাপতি অধ্যাপক রোকেয়া খাতুন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট জেলা সাধারণ সম্পাদক পরমানন্দ দাস প্রমুখ।

বগুড়া: সাতমাথায় অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য কমরেড মনজুর আলম মিঠু এবং বগুড়া জেলা নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন জেলা সমন্বয়ক কমরেড সামছুল আলম দুলু।

বগুড়ার শেরপুরে রুশ বিপ্লবের শততম বার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে র‍্যালি

সিলেট: গত ৯ডিসেম্বর'১৭ বিকাল ৪ টায় সিলেট শহীদ মিনারে জনসভা ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৃষ্টিপাতের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে সিলেট জেলা ২ নং বার হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে বেলা ৩টায় সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চল, পাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শত শত শ্রমিক-কর্মচারী-পেশাজীবি-ছাত্র-নারী একে একে জড়ো হতে থাকে। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল। জেলা আহ্বায়ক কমরেড উজ্জ্বল রায় সভাপতিত্ব করেন এবং জেলা কমিটির সদস্য সুশান্ত সিনহা সভা পরিচালনা করেন। আরও বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য হুমায়ূন রশীদ সোয়েব।

রোকেয়া দিবস উদযাপন

রোকেয়া দিবসে গাইবান্ধার র‍্যালি

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ৯ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি চত্বর থেকে র‍্যালি সহযোগে রোকেয়া হল প্রাঙ্গনস্থ রোকেয়া ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং বিকাল ৩.৩০ টায় ডাকসু কনফারেন্স হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও ঢাকা নগর শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা আক্তার রুবি, সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন।

বাম ঐক্য প্রসঙ্গে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি চাই

(১ম পৃষ্ঠার পর) রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে মহাজোট সরকার। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের হুমকি দিয়ে দরকষাকষির চেষ্টা করছে তারা। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকারি ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে প্রহসনের নির্বাচন করে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবারো সরকার গঠন করতে চাইবে। কোনো কারণে তারা যদি সেটা করতে ব্যর্থ হয় এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক নানা শক্তির চাপে যদি কিছুটা অবাধ নির্বাচন হয়ও বা তাতে যে-ই জিতুক তাতে জনগণের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হবে না।

অতীত অভিজ্ঞতায় এ কথা পরিষ্কার, এদেশের প্রধান দুই বুর্জোয়া দল এবং তাদের সহযোগী পার্টিগুলো কেউই আজ আর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধারণ করে না। কারণ, তাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দর্শন হচ্ছে পুঁজিবাদী – যার মূলকথা উৎপাদন যন্ত্রের উপর ব্যক্তি মালিকানা এবং মালিকদের মুনাফার লক্ষ্যেই উৎপাদন ব্যবস্থা বা অর্থনীতি পরিচালিত হওয়া। ফলে, সমাজে সবাই মিলে সম্পদ তৈরি করলেও তার প্রধান অংশ জমা হয় মালিকের হাতে, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ পায় ছিটেফোঁটা ভাগ।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক পরিবারতন্ত্র এবং বেপরোয়া লুটপাট। পারিবারিক উত্তরাধিকারভিত্তিক দুই বুর্জোয়া দলের পালাক্রমে দুঃশাসন দেশবাসীকে জিম্মি করে রেখেছে। মানুষ এ থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু বিকল্প কোথায়? বিকল্প না পেয়ে জনগণ এক দলের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে আরেক দলকে ভোট দেয়। বাস্তবে অলৌকিকভাবে কোনো বিকল্প শক্তি হাজির হবে না। বিকল্প শক্তি হতে হলে জনস্বার্থে বিভিন্ন দাবিতে ধারাবাহিকভাবে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কেবল এই পথেই বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি নির্মাণ সম্ভব হবে। আওয়ামী লীগ-বিএনপির বাইরে কিছু শক্তিকে একত্র করলেই বিকল্প গড়ে উঠবে – বিষয়টি অত সহজ নয়। জনগণকে সংগঠিত করতে দরকার দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম, দরকার বিকল্প কর্মসূচি। পুঁজিবাদ বিরোধী কর্মসূচিকে কেন্দ্রে রেখে জনগণের আশু গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের পথেই সত্যিকার বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে উঠতে পারে।

এই কাজটি করার দায়িত্ব দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর। তাদের সাংগঠনিক শক্তি খুব সীমিত। কিন্তু তারা শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের স্বার্থে রাজনীতি করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। গণতান্ত্রিক অধিকার, জাতীয় সম্পদ রক্ষা, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, কৃষকের ফসলের দাম, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ গণমুখী ইস্যুতে এবং দলীয়করণ-দখলদারিত্ব-লুণ্ঠন-মূল্যবৃদ্ধিসহ দুঃশাসনের প্রতিবাদে তারাই সাধ্যমত কর্মসূচি পালন করেন। সঠিক কর্মপন্থা অনুসরণ করলে তারাই দেশের অবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

সম্প্রতি দেশের বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলোর ঐক্য প্রচেষ্টা প্রগতিশীল মহলে আশাবাদ তৈরি করেছে। এই বাম-গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নীতি হবে দেশের সমস্ত সংকট নিয়ে 'সর্বোচ্চ বোঝাপড়া সর্বনিম্ন কর্মসূচি'র ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন পরিচালনা করা। জনগণের ইস্যুতে কার্যকরীভাবে ভূমিকা রাখতে পারলে তবেই এই জোট আশার সঞ্চার করতে পারবে। আন্দোলন করতে করতে নির্বাচন সন্নিকটে এলে তখন তাতে যুক্ত হওয়া-না হওয়া নিয়ে আলোচনা করে ঠিক করা যাবে। কিন্তু জোটের ক্রিয়াকলাপ যদি কেবল নির্বাচনের উদ্দেশ্যে হয়, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হয়, তবে তা কখনোই দেশের মেহনতী মানুষের সামনে পরিবর্তনের পথ দেখাতে পারবে না, কিছু প্রতিক্রিয়াধর্মী কর্মসূচির মধ্যেই কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকবে। যুক্ত আন্দোলন সম্পর্কিত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে দেশের জনগণের সামনে আনতে হবে।

এখানে, বামপন্থী দলগুলোর অভ্যন্তরে কিছু প্রবণতা কাজ করে যা খোলামেলা আলোচিত হওয়া দরকার। তা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী বা কষ্টকর সংগ্রাম এড়িয়ে মিডিয়ানির্ভর কিছু কর্মসূচি পালন করে দৃশ্যমান থাকা। পাশাপাশি এর-ওর সাথে জোট বেঁধে নির্বাচনে কিছু করে ফেলার চিন্তা। আমরা আগেও বলেছি, বামপন্থীদের সাংগঠনিক শক্তি যা তাতে এই মুহূর্তে নিজেদের শক্তিতে নির্বাচনে অবস্থান প্রতিষ্ঠার কোনো বাস্তবতা নেই। তা করতে গেলে হতাশ হতে হবে। আবার শক্তি বাড়ানোর জন্য বিতর্কিত শক্তিগুলোর সাথে নির্বাচনী সমঝোতা করলে তা বামপন্থীদের নীতিগত অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। নির্বাচনে অংশগ্রহনের পরিবেশ থাকলে আন্দোলনের বক্তব্য প্রচার করতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার দরকার হবে। কিন্তু যেকোনোভাবে বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা বামপন্থীদের প্রধান লক্ষ্য হতে পারে না। জনগণের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী পরিবর্তনের লক্ষ্য ছাড়া নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্ব পাওয়ার চেষ্টা সুবিধাবাদের জন্ম দিতে পারে।

বামপন্থী নেতা-কর্মী-দরদীদের প্রতি আমাদের আবেদন –নির্বাচনের লক্ষ্যে নয়, আন্দোলনের জন্য বামপন্থীদের জোট গড়ে তুলুন। 'উদার-গণতন্ত্রী' নাম দিয়ে সামরিক স্বৈরাচার ও বুর্জোয়া শাসনের সহযোগী বিতর্কিত ব্যক্তিবর্গ – গণআন্দোলনে যাদের দেখা যায় না –তাদের কাঁধে ভর দিয়ে নির্বাচনী রাজনীতিতে 'দৃশ্যমান' হওয়ার ভ্রান্ত মোহ ত্যাগ করুন।

রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভারতের 'এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)' পার্টির বিশাল সমাবেশ

মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারতের 'এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)' পার্টির উদ্যোগে গত ১৭ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো এক বিশাল সমাবেশ। সমাবেশের তিনদিন আগে থেকেই চলছিল ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দেশের ২৩টি রাজ্য থেকে মানুষ এসেছে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, কোনো কোনো রাজ্য থেকে আসতে যেখানে দু-তিন দিন পর্যন্ত সময় লাগে। সমাবেশের সময়ও চলছিল বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজে, মাথায় ছাতা ধরে, কোনোরকমে কোলের শিশুটির মাথা বাঁচিয়ে সমাবেশের বক্তব্য শুনেছেন হাজার হাজার মানুষ।

দলের পলিট ব্যুরোর সদস্য মানিক মুখার্জির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন এসইউসিআই'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। তিনি বলেন,"মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে গঠিত দল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রতিদিনই বিকশিত হচ্ছে – এটা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য খুবই আশার দিক। কোনো মন্ত্রী-এমপি ছাড়া, পুঁজিপতিদের ব্যাকিং ছাড়া কেবলমাত্র আদর্শের জোরে এই দল এত বড় জমায়েত করেছে, গোটা বিশ্বের যেখানেই মেহনতি মানুষ লড়ছে তাদের সকলকেই এই সংবাদ অনুপ্রাণিত করবে। আমাদের দেশে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনাদের দলের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য শিক্ষা হিসেবে থাকবে।"

কী পেল দেশের মানুষ?

(৩য় পৃষ্ঠার পর) না পেরে ধুঁকে ধুঁকে জীবনের পথ চলছে। চিকিৎসার কামনা করতে পারে না বরং মৃত্যুকে কামনা করে। অন্যদিকে এই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে চলছে রমরমা ব্যবসা। একের পর এক গড়ে উঠছে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্লিনিক। গাইড বই ও কোচিং ব্যবসাও জমজমাট। এই প্রক্রিয়ায় ফুলে ফেঁপে উঠছে ব্যবসায়ী শ্রেণি।

শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অবনমন ঘটছে। ২০১৪ সালে একতরফা নির্বাচনে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের প্রকোপ বেড়েছে। সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে ফ্যাসিবাদী শাসনের ভিত মজবুত করছে। ক্রমাগত বেড়েছে দলীয়করণ। প্রশাসনসহ সর্বক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ বেড়েছে। বিশেষত সম্প্রতি ষোড়শ সংশোধনীর রায়কে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতিকে যেভাবে অপদস্থ ও হেনস্তা করে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে তা শুধু বাংলাদেশে নয়, পুরো বিশ্বেই নজিরবিহীন। কোনো সমালোচনা, কোনো বিরোধী মত সরকার সহ্য করতে পারছে না। তাই সরকারের অপকর্মের বিরুদ্ধে মানুষের কণ্ঠরোধ করার জন্য তথ্য প্রযুক্তি আইনে ৫৭ ধারাসহ একের পর এক কালো আইন তৈরি করছে। পাস করেছে 'দায় মুক্তি আইন ২০১০'। রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎখাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অনিয়মের বিরুদ্ধে কেউ যাতে আদালতের আশ্রয় নিতে না পারে সেজন্য। এই হলো 'গণতান্ত্রিক' সরকারের গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের নমুনা। এই হলো মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধে চেতনা!

সরকারের দমনমূলক-কর্তৃত্বমূলক শাসনের ফলে সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে তার প্রভাব পড়ছে। সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। বাড়ছে গুম-খুনের ঘটনা। সম্প্রতি জঙ্গিবাদ বিষয়ক গবেষণারত নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোবাশ্বার হাসান সিজার নিখোঁজ হয়েছেন। এখনো তার সন্ধান মেলেনি। তার মধ্যেই খবর এসেছে সাবেক একজন রাষ্ট্রদূত নিখোঁজ হয়েছেন। এইচ আর ডব্লিউ বলছে, ২০১৭ সালের প্রথম পাঁচ মাসেই এরকম ৫৭ জন ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন।গুম-খুন-অপহরণ-শিশু নির্যাতন-নারী নির্যাতন – এসব নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজধানীতে কয়েকদিন আগে পরপর জোড়া খুনের ঘটনা ঘটল। এসব ঘটনায় দেখা যায়, পারিবারিক কলহ-দাম্পত্য কলহ বাড়ছে। বাড়ছে নারী নির্যাতন। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আওতায় তৈরি এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৫ হাজার ৮২৫টি। আর ২০১৭ সালের একই সময়ে ৯ হাজার ১৯৫টি নারী নির্যাতনের ঘটনা। যা শতাংশের হিসাবে ৫৮ ভাগ বেশি।

এই তো স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর আমাদের দেশের পরিস্থিতি। উন্নতির চিত্র! রাস্তায় চলতে ফিরতে বিলবোর্ডে কিংবা সরকারি বিজ্ঞাপনে যে উন্নয়নের চিত্র আমাদের দেখানো হয় তার সাথে বাস্তব চিত্রের কোনো মিল নেই। কিন্তু কেন নেই? কেন দেশের আজ এই পরিস্থিতি তার সঠিক কারণটা কি আমরা কখনো বোঝার চেষ্টা করেছি?

মুক্তিযুদ্ধে লাখ লাখ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র অকাতরে প্রাণ দিলেও, জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করলেও সে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল এদেশের উঠতি ধনিকশ্রেণির দল আওয়ামী লীগ। স্বাধীনতার পর তাদের নেতৃত্বে সেই ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল নিয়মই হলো শোষণ। শোষণ করেই মালিকের মুনাফা বাড়ে। তাই মালিক শ্রেণির দল হিসেবে ক্ষমতায় এসে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো মালিকদেরই স্বার্থ রক্ষা করে, মালিকদেরই উন্নয়ন হয়। তাই এদেশে আজ ২ জন কোটিপতির জায়গায় ৫০ হাজার কোটিপতি তৈরি হয়। অন্যদিকে দারিদ্র্য বাড়ে, বৈষম্য বাড়ে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ৪৬ বছর পর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির খতিয়ান মেলাতে চাইলে আমাদের একথা বুঝতে হবে – শোষণমুক্ত মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে শোষণের বৃষবৃক্ষ যে পুঁজিবাদ – তাকে উপড়ে ফেলতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। না হলে শোষণমুক্তির স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে।

গণআন্দোলনের বিকল্প নেই

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) লেখা হলো গণ মানুষের গান, প্রতিটি সমাবেশ শেষে পরিবেশন হতো সেই গান। আন্দোলন যখন আরো তুঙ্গে উঠল তখন সুরক্ষা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আমীর উদ্দীনকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর রুমে ঢুকে সরকারি সংগঠন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অস্ত্র ধরে হুশিয়ারি দিয়ে যায়। এর ফল হলো উল্টো। চট্টগ্রামবাসীর ক্ষোভ বিস্ফোরিত হলো । শুরু হলো আরও প্রতিবাদ, মিছিল।

৪ ডিসেম্বর নগর ভবন ঘেরাওকে সামনে রেখে করদাতা সুরক্ষা পরিষদের নেতৃবৃন্দ ৪১টি ওয়ার্ডে অলিতে-গলিতে প্রচারণা চালায়। প্রতিদিন ট্রাকে করে ওয়ার্ড অভিযাত্রা, লিফলেট বিলি, মাইকিং, সমাবেশ করে। এই অভিযাত্রাকালে বিভিন্ন পয়েন্টে মেয়র সমর্থিত ছাত্রলীগের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণ জনগণকে যুক্ত করে যে আন্দোলন তাকে বাধা দেবে কে? সমস্ত ধরনের ভয়-ভীতি, বাধাকে উপেক্ষা করে আন্দোলন এগিয়ে যায়। সেই আন্দোলনের তহবিল বা ফান্ড তৈরি হয় জনগণের সহযোগিতায়।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে নগর ভবন ঘেরাও-এর চারদিন আগে গণআন্দোলনের চাপে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে স্থগিত করে ভাড়ার ভিত্তিতে গৃহকর নির্ধারণ। পরবর্তীতে করদাতা সুরক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। অন্যায্য ট্যাক্স বাতিল হওয়ায় কয়েক হাজার মানুষের বিজয় সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, এই আন্দোলন শেষ নয় বরং শুরু। আগামী দিনে যেকোনো নাগরিক অধিকার আদায়ের দাবি নিয়ে আরো বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবে।'

এই আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা রেখেছেন করদাতা সুরক্ষা পরিষদের সভাপতি নুরুল আফসার, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আমীর উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক , সাবেক কাউন্সিলর ও বাসদ (মার্কসবাদী) নেত্রী জান্নাতুল ফেরদাউস পপি; করদাতার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান মারুফ রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ারুল করিমসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

আমরা দেখতে পেলাম চট্টগ্রামবাসীর উপর যে বিশাল করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলো, সে সময় বড় রাজনৈতিকদলগুলো যারা জনগণের কথা বলে মুখে ফেনা তোলে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে, মুক্তিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়ান বলে নিজেদের ঘোষণা করে তাদের নেতৃত্ব তখন জনগণের পক্ষে ছিল না। ছিল না প্রধান বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ। চট্টলাবাসী দেখলো অভিভাবক মেয়রের আসল রূপ! দেখেছে জনপ্রতিনিধি ওয়ার্ড কাউন্সিলররা অনেকে জনগণের পাশে নেই। তাই আবারো প্রমাণিত হলো জনজীবনের সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জনগণের নিজস্ব শক্তিতে গণকমিটি করে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি লুটপাটকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) বাড়ানোর আসল কারণ নয়। বিষয়টি বোঝার জন্য কিছু তথ্য জানা দরকার। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রায় ৫ হাজার মেগাওয়াট। এর মধ্যে পিডিবি উৎপাদন করত ৭০ শতাংশ। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াট। পিডিবি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মিলে পাবলিক খাতে উৎপাদন হয় ৫৬ শতাংশ। অন্যদিকে ব্যক্তি খাতে (বেসরকারি) উৎপাদন হয় ৪৪ শতাংশ। বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র বিশেষত রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বৃদ্ধি পাওয়ার পর থেকে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সব খরচই বেড়েছে। দৈনিক পত্রিকা 'বণিক বার্তা'র গত ৪ ডিসেম্বরের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে বর্তমানে পুঁজি লগ্নি করে সবচেয়ে বেশি মুনাফা আসে যে খাত থেকে, তা হলো বিদ্যুৎ। বাংলাদেশের বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদকদের মুনাফার হার ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তালিকাভুক্ত বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। লগ্নিকৃত মূলধন ও ব্যবহৃত সম্পদের বিপরীতে রিটার্নেও এগিয়ে আছে তারা। যেকোনো দেশে আপদকালীন সময়ে বা জরুরি প্রয়োজনে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হয়। কিন্তু এগুলো অর্থনীতিতে বড় ধরনের আর্থিক চাপ তৈরি করার কারণে দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী হয় না। অথচ আমাদের এখানে ব্যবসায়ীদের লুটপাটের জন্য ২০১৩ সালে বন্ধ করে দেয়ার কথা থাকলেও ২০২০ সাল পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজার অনুযায়ী তেলের দাম কমালে বিদ্যুতের দামও কমানো যেত

বর্তমানে চালু থাকা ১০৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে তেলভিত্তিক কেন্দ্র রয়েছে ৪৬টি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রায় ৩ গুণ কমলেও দেশে সে অনুযায়ী কমানো হয়নি। যেন বিপিসি-র কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি লিটার ফার্নেস অয়েল ৪২ টাকা দরে পিডিবি-র প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়ে ১২ টাকা। অথচ ব্যক্তিখাতে রেন্টাল, কুইক রেন্টাল বা অন্য যেসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরকার বিদ্যুৎ কেনে, তাদের বাজারমূল্যে কেনার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যে কারণে তারা প্রতি লিটার ফার্নেস অয়েল ২২-২৪ টাকায় আমদানি করে। ফলে তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ পড়ে ৬ টাকা প্রতি ইউনিট। এ বিদ্যুৎ তারা আবার বেশি দামে বিক্রি করে পিডিবি'র কাছে। এ কারণে বিদ্যুতের গড় উৎপাদন ব্যয় যাচ্ছে বেড়ে। আর দাম সমন্বয়ের ফলে তাকে জনগণের ঘাড়ে তুলে দেয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজার দরের সাথে তেলের দাম সমন্বয় করলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর বদলে কমানোই সম্ভব ছিল।

আবার পিডিবি তার উৎপাদিত বিদ্যুৎ কম দামে বিক্রি করে বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানিগুলোর কাছে। ফলে তার লস বেশি। এটাকে পূর্বে ভর্তুকি বলা হতো। সেটিকে এখন ঋণ হিসেবে ধরে নিয়ে সুদও চার্জ করা হচ্ছে। এরকম নানা মারপ্যাচে সরকার জনগণের পকেট কাটছে আর লুটপাটের সুযোগ করে দিচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শামসুল ইসলাম এক হিসেবে দেখিয়েছেন, সরকারি খাতে গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে উৎপাদন ক্ষমতার ৪৩% ব্যবহার হয়। এতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় হয় ২.০২ টাকা। অন্যদিকে রেন্টাল, কুইক রেন্টালে উৎপাদন ক্ষমতার ৭১ শতাংশের বেশি ব্যবহৃত হয়। তাদের ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় হয় ৩.৩৭ টাকা। সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো যদি রেন্টালের মতো উৎপাদন ক্ষমতার ৭১ শতাংশ ব্যবহার করত, তাহলে প্রতি ইউনিটে তাদের ব্যয় হতো ১.৫৫ টাকা। অর্থাৎ ১.৫৫ টাকায় যে বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব, সরকার তা ৩.৩৭ টাকায় কিনছে। এতে বছরে ১৩০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

ডিজেলে আমদানি ব্যয় হ্রাস-সমন্বয় করা হলে প্রতি ইউনিট ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৬ টাকা উদ্বৃত্ত হবে এভাবে। ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ থেকেই প্রায় ২১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় সম্ভব।

রেন্টাল-কুইক রেন্টাল প্রথম যে মেয়াদে এসেছিল, ধরা যাক তিন বছর, সেই তিন বছরে তার কাছ থেকে যে মূল্যহারে সরকার বিদ্যুৎ কিনেছে, তার মধ্যেই ওই কেন্দ্র স্থাপনের ব্যয় রয়েছে। এরপর মেয়াদ বাড়ানোর সময় তাদের আর জ্বালানি খরচের বাইরের অ-জ্বালানি ব্যয় আগের মতো থাকার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেছে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় মেয়াদের রেন্টাল-কুইক রেন্টালের অ-জ্বালানি ব্যয় সরকারি খাতের বিদ্যুৎকেন্দ্রের অ-জ্বালানি ব্যয়ের চেয়ে প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ বেশি। যৌক্তিক হারে মূল্য নির্ধারিত হলে এখান থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় সম্ভব।

মেরিট অব অর্ডার অনুযায়ী কম দামের বিদ্যুৎ বেশি কিনে এবং বেশি দামের বিদ্যুৎ কম অংকের অর্থ সাশ্রয় করা যায়। যেমন- সরকারি খাতের উৎপাদন ক্ষমতার ১৪ শতাংশের বিপরীতে নজো পাডিকের উৎপাদন ক্ষমতা ৩০ শতাংশ ব্যবহার করে বেশি ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেনায় প্রায় ১১০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এখানে কম উৎপাদন করা গেলে সাশ্রয় হতো। মেঘনাঘাটে ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করলে খরচ কম পড়ত। আবার ৪০ শতাংশ ক্ষমতা ব্যবহার করে ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখানে ফার্নেস অয়েল বা গ্যাসে উৎপাদন করা গেলে সাশ্রয় হতো। সব মিলিয়ে দেখা যায়, পাইকারি বিদ্যুতের বিদ্যমান মূল হারেই ভোক্তাদের কাছ থেকে প্রায় ৬৬০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় হচ্ছে।

বিদ্যুৎ চাই, কিন্তু বহুমুখী ক্ষতির বোঝা চাই না

যে উন্নয়ন দর্শন নিয়ে সরকার চলছে, তাতে সেবাখাতসমূহ ক্রমাগত বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে। ব্যবসার সুযোগে মুনাফা লুটের উন্মত্ত প্রতিযোগিতার দাপটে অধিকার হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ। কখনো পরিবেশ-জীবন-জীবিকার ক্ষতির আশঙ্কা উপেক্ষা করে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, কখনো বা ১ লক্ষ ১৪ হাজার কোটি টাকার বিপুল ব্যয়ের বোঝা নিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রচেষ্টা গায়ের জোরে অগ্রসর করছে সরকার। আখেরে যে বিদ্যুৎ মানুষ পাচ্ছে বা পাবে, চড়ামূল্যে সরকারি অপরিণামদর্শিতার পরিণাম ভোগ করছে সাধারণ মানুষ। এখনই সে লক্ষণ স্পষ্ট। যে দেশে ১০ বছরে ৬ লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়, খেলাপী ঋণ জমে সোয়া লক্ষ কোটি টাকা, সে দেশে দুর্নীতিবাজ লুটপাটকারীদের বহাল তবিয়তে রেখে জনগণের উপর মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আজ সময়ের প্রয়োজন। সংগ্রামের পথ ধরেই কেবল সাধারণ মানুষের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে।

গাঢ় লিকারের কষ্ট

(১ম পৃষ্ঠার পর) কাব্যে-সাহিত্যে, শিল্পে-সংগীতে চলে এরই বর্ণীল আখ্যান। জীবনের এইসব সূক্ষ্ম প্রকাশ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বিষাদ সবখানে গাঢ় লিকারের এক কাপ চা, আহ! কী গভীর তৃপ্তি, নিশ্চিত নির্ভার। শুধু কি তাই? এ তো একদিক মাত্র। শিল্পীর নিপুণ আঁচড়ের মতো সাঝানো সবুজের রাজ্য চা বাগান, কী দারুণভাবে টানে আমাদের। নাগরিক জীবনের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয় প্রকৃতির নির্মল পরশে। অনেকের কাছে এই তার আকর্ষণ, এই তার পরিচয়। অথচ আলোর নীচে অন্ধকারের মতো আরেকটি চিত্রও এখানে প্রকট, তা আমরা জানি ক'জন? শৈল্পিক সৌন্দর্যে আর প্রাণ মাতানো সৌরভে বিমোহিতজন কতটুকু খোঁজ রাখেন কত কান্না, রক্ত, আর্তনাদ আছে এর ভেতর?

বাসকী চৌহান, হবিগঞ্জের লস্করপুর চা বাগানের শ্রমিক। বয়স ৪২ কি ৪৩ বছর হবে। কখন, কীভাবে বাগানের কাজে যুক্ত হয়েছেন তা মনে নেই। তিন সন্তানের জননী বাসকী গত ৫/৬ মাস থেকে অসুস্থ, কী হয়েছে জানেন না। কিন্তু গোটা শরীর প্রায় পঁচে গেছে। শয্যাশায়ী অবস্থা। খাবার দিতে হয় তরল করে। ৮/১১ ফুটের ঝুপড়ি ঘরে স্বামী, সন্তান, হাঁস, মুরগি নিয়ে বেঁচে আছেন কোনো মতে। ৪/৫ বার চিকিৎসার জন্যে বাগানের ডিসপেনসারিতে গিয়েছেন, কম্পাউন্ডার সাহেব কয়েক দফায় হিসটাসিন, প্যারাসিটামল দিয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে আশ্বাস দিয়েছেন! আর বাগান কর্তৃপক্ষ, শ্রমিকের এ রকম দুঃসময়ে কি চুপ থাকতে পারেন, মহান তারা, তারাও দু'দফায় চিকিৎসার জন্যে ১৭'শ টাকা দিয়েছেন। কী চমকে উঠলেন? ওঠারই কথা। এমন শত সহস্র বাসকী'র জীবনের সব রং নিংড়ে নিয়েই তৈরি হয় পরম তৃপ্তির চা আর নান্দনিক সৌন্দর্যের চা বাগান।

বর্তমানে চা বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল, বিশ্বের ২৫টি দেশে বিশ্ববাজারের মোট ২ শতাংশ চা বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়। প্রায় ১২ লক্ষাধিক চা জনগোষ্ঠীর পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ শ্রমে সচল হয় দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রতিদিন তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে যে সম্পদের সৃষ্টি তা নিজেদের জীবনে কাজে না লাগলেও তাতে প্রতিদিন ফুলে ফেঁপে ওঠে মালিকের ধনভাণ্ডার। এরই নাম মালিকী ব্যবস্থা, পুঁজিবাদ। আজ যখন ১ কেজি মোটা চালের দাম ৬০ টাকা, পেঁয়াজ ৮০/১০০ টাকা তখন চা শ্রমিকের মজুরি মাত্র ৮৫ টাকা। বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের নিয়ে আইএলও'র প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ৫৫% চা শ্রমিকের মাসিক আয় ১৫০১ টাকা, ৩৩ শতাংশের ১৫০০ টাকা এবং মাত্র ২ শতাংশ চা শ্রমিকের মাসিক আয় ৩ হাজার টাকা। গত ১০ বছরে চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি বেড়েছে ৫৩ টাকা! সরকার প্রতিদিন উন্নয়নের গল্প শোনায়, সত্যি এ উন্নয়ন বটে! এই মজুরি দিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা তো দূরের কথা কোনো রকমে বেঁচে থাকাই দায়। যুগ যুগ থেকে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চা শ্রমিকরা বসবাস করলেও ভূমির অধিকার তো অনেক দূরের কথা, একটি আলো বাতাসহীন ঝুপড়ি ঘরে কোনো রকমে বসবাস করে। দৈনিক খাবার তালিকায় প্রধানত পোড়া রুটি, চা পাতা ও আলু ভর্তা এবং নিজেদের তৈরি লাল চা। ফলে পুষ্টির ন্যূনতম চাহিদাও পূরণ হয় না আবার কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্র, বিশ্রাম এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভাবে চা শ্রমিকরা আছেন চূড়ান্ত স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। ১৯৬৬ সালের 'টি প্ল্যান্টেশন লেবার অর্ডিনেন্স' ও ১৯৭৭ সালের 'প্ল্যান্টেশন রুলস' অনুযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাগান কর্তৃপক্ষের। কিন্তু তা আছে কাগজে কলমে। সারা দেশের ১৬৪টি চা বাগানের মধ্যে ১ জন করে এমবিবিএস ডাক্তার আছেন মাত্র ৬টিতে। আইএলও বলছে ৬৩ শতাংশ শ্রমিক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আছে। চা শ্রমিকদের মধ্যে ৭২ শতাংশ পেটের ব্যথা, ৮৪ শতাংশ মাথা ব্যথা এবং ৭৪ শতাংশ শ্রমিক মাংসপেশির ব্যথায় ভুগছেন। চা শ্রমিকদের আর একটি বড় সমস্যা রক্তশূন্যতা। আবার চা শ্রমিকদের মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী শ্রমিক, তাদের অবস্থা আরও করুণ। শ্রম আইনে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস কার্যকর হলেও বাগানে কোনোরকমে ৪ মাস চলে। আর ৯১ ভাগ নারী শ্রমিকরা তাদের সর্দারদের দ্বারা নিগ্রহের শিকার হয়। আরও বহুদিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে সরকার ও মালিকী ব্যবস্থার সত্যিকারের চিত্র উন্মোচন করা যাবে কিন্তু এই কি যথেষ্ট নয়?

এই তো এদেশের শ্রমিকদের জীবন। শ্রমিক শ্রেণির সকল সাধ, স্বপ্ন কেড়ে নিয়ে তৈরি হয় মালিকের মুনাফার সৌধ। আর একেই সরকার ঘোষণা দেয় উন্নয়ন বলে। এ উন্নয়ন কার? এ সরকার, রাষ্ট্র কার?

কড়াইল বস্তি উচ্ছেদ করে লাখো মানুষকে পথে বসানো যাবে না

গভীর রাত। হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা। দাউ দাউ করে জ্বলছে চারপাশ। চোখে ঘুম নিয়েই এক দল ছেলে-মেয়ে ছুটে চলছে আগুন নেভাতে। না, নিজের ঘরটা নয়। বাঁচাতে গেছে তাদের বহু যত্নে গড়া পাঠাগারটিকে। শহীদ রুমি স্মৃতি পাঠাগার তার নাম। একে রক্ষা করতে না পারলে তাদের স্বপ্নগুলোও যে মরে যাবে। এ পাঠাগারে বসেই তো তারা জীবনের কথা বলে, বড় মানুষ হবার স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায় অনেককে। শুধু কিছু ছেলে-মেয়ে নয়, পাঠাগারের সাথে যুক্ত তাদের পরিবারগুলোও। অভিভাবকরাও যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। এখানে যুক্ত হলে অন্তত নষ্ট হবার ভয় থাকে না। এত ভালোবাসার পাঠাগার কি আগুন পোড়াতে পারে? সবার সম্মিলিত চেষ্টায় সেদিন পাঠাগারটিকে রক্ষা করা গিয়েছিল। এই পাঠাগারটি ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশান-বনানীর মাঝখানে, দক্ষিণ এশিয়ার সবচাইতে বড় বস্তি কড়াইলে অবস্থিত। পাঠাগারটি রক্ষা করা গেলেও কিছু প্রশ্ন সামনে এসেছে, কেন কিছুদিন পর পর এই বস্তিতে আগুন লাগে? কারা লাগায়?

কড়াইল বস্তিতে প্রায় ৩ লাখ মানুষ বসবাস করে। সবাই শ্রমজীবী মানুষ। এদের মধ্যে কেউ গার্মেন্টসে কাজ করে, কেউ রিকশা চালায়, কেউবা দিনমজুর। শ্রমজীবী এই মানুষদের পেটে লাথি মারার মতো একটি ঘোষণা গত কিছু দিন আগে পুলিশ প্রধান দিলেন। বললেন, 'এই বস্তি উচ্ছেদ করা হবে।' কেননা এখানে মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, অপরাধীরা থাকে। তাদের কারণে সমাজে অপরাধ বাড়ছে। এদের ধরতে হলে এই বস্তি উচ্ছেদ করতে হবে।

বস্তিতে থাকে কারা? দরিদ্র মানুষ, যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, মূলত তারাই এখানে বাস করে। গ্রামে কাজ নেই। সবকিছু খুইয়ে শহরে এসেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ক্ষুদ্র ঋণের কারবারীদের চাপ ইত্যাদি বহু কারণে একদল মানুষ কোনো মতে বেঁচে থাকবার জন্যই তো এখানে আশ্রয় নেয়। ঢাকা শহরসহ অন্যান্য বড় শহরগুলোতে এমন মানুষদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। বাড়ছে, কেননা এই মানুষগুলোর জন্য এলাকাভিত্তিক কোনো কাজের ব্যবস্থা সরকার করতে পারেনি।

বেঁচে থাকার ব্যবস্থা সরকার করতে না পারলে কী হবে? অত্যাচার তো করতে পারবে। তাই বস্তি উচ্ছেদের ফরমান এসেছে। বলা হয়েছে, বস্তিগুলো অপরাধীদের আবাসস্থল। যেন অপরাধ কেবল বস্তিতে হয়! বস্তিতে যেমন অপরাধ হয় তেমনি অভিজাত পাড়াগুলোতেও চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ, মাদক চোরাচালান সবই হয়। সারা দেশেই তো একই চিত্র। যে অপরাধ করবে, দেশের আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে। তাহলে বস্তি উচ্ছেদের প্রশ্ন আসে কেন? আর অপরাধীদের ধরবে যারা, সেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজনদেরও তো এসবের সাথে যুক্ত থাকার খবর প্রায়ই শিরোনাম হয়। সর্ষের ভেতর ভূত থাকলে, ভূত সারাবে কে? এ কথাও সবার জানা যে, যারা মাদক ব্যবসা ও নানা ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত তাদের বেশিরভাগই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে টিকে থাকে। সরকার কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না। তাহলে বস্তি উচ্ছেদের উদ্দেশ্য কী?

বস্তিতে বসবাস করা শহিদুল নামের এক কলেজ ছাত্র জানালো এর কারণ। বললো, 'গুলশান সোসাইটির উদ্যোগে গুলশান লেক সম্প্রসারণ করার কথা। কিন্তু এই বস্তি থাকার কারণে সেই কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে যেকোনো মূল্যে তারা বস্তি উচ্ছেদ করতে চায়।' আরেকটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করার মতো। সম্প্রতি কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় কিছু রিপোর্ট এসেছে। বলা হচ্ছে, বস্তিটি উঠিয়ে দিয়ে সেখানে গড়ে তোলা হবে 'তথ্যপ্রযুক্তি গ্রাম'। কাগজপত্রে এর নাম হবে 'মহাখালী আইটি ভিলেজ'। (সূত্র : বাংলাদেশ টুডে, ২৬ নভেম্বর '১৭) সরকার বলছে তারা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে, পুনর্বাসন করবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে ইত্যাদি। এর আগেও যখন আগারগাঁও, মোহাম্মদপুর কিংবা মিরপুরে বস্তি উচ্ছেদ করা হয়, তখন তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য এ ধরনের কথা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ এলাকাতেই পুনর্বাসন কার্যক্রম খুব সামান্যই বাস্তবায়িত হয়েছে। কড়াইলের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি হবে, এটা সহজেই বলা যায়।

আজ ঢাকাকে আধুনিক নগরীতে পরিণত করতে চায় সরকার। কিন্তু এই আধুনিকতা কার স্বার্থে? কাদের স্বার্থে গরীব মানুষদের একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই সরকার উচ্ছেদ করতে চাইছে? পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় সরকারের এই পরিকল্পনা দেশের মুষ্টিমেয় বড়লোকদের জন্য। আইটি ভিলেজ তো বড়লোকদের জন্য দরকার। তারা কাড়ি কাড়ি টাকা বিনিয়োগ করবে, প্রযুক্তির ব্যবসা করবে। এজন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে বসবে কি না, তা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ভাবনার সময় নেই। একইভাবে কড়াইল বস্তি উচ্ছেদ করে গুলশান লেকের নয়নাভিরাম দৃশ্য তৈরি করতে পারলে তা তো বড়লোকদের জন্যই উপভোগের ব্যাপার হবে। আমরা বুঝতে পারি এদেরই স্বার্থে রাতের অন্ধকারে বারে বারে আগুনের লেলিহান শিখা বস্তির বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, সেখানকার মানুষদের সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে।

আজ এ কথা বোঝার সময় এসেছে, আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামাত এরা কেউই গরীব মানুষদের দল নয়। এদের প্রত্যেকের চরিত্র এক। এরা যখন যারা ক্ষমতায় ছিল, প্রত্যেকে গরীব-অসহায় মানুষদের বঞ্চিত করে বড়লোকদের সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলায় সহযোগিতা করেছে। আজ কড়াইলের বস্তি উচ্ছেদের ঘটনার সাথেও একই উদ্দেশ্য জড়িত। তাই সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধ হবার। একসাথে লড়াইয়ে নামার।

কড়াইল বস্তির ছেলে-মেয়েরা শহীদ রুমি স্মৃতি পাঠাগারকে যেভাবে রক্ষা করেছে, তা একটি প্রতীকী ব্যাপারও। তাদের এই চেষ্টা বলে গেল, একইভাবে শাসকদের লোভের আগুন থেকে বাঁচতে হলে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করতে হবে। এখান থেকে পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই। কেননা এ লড়াই বাঁচার লড়াই, স্বপ্নগুলোকে জীবন্ত রাখার লড়াই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০ বছর পূর্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) জন্য যে কমিশন গঠন করা হয়েছে তার কার্যকারিতা নেই। বরং ভূমি সমস্যা পাবর্ত্য অঞ্চলে সমাধান না করে চুক্তির পর সরকার হাজার হাজার একর জমি নানা সংস্থার কাছে লিজ দিয়ে, নানান অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। এখনও পর্যন্ত অব্যাহতভাবে পাহাড়ীদের ভূমি দখল করা হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে সংঘাতের কারণে'৮০ ও '৯০ এর দশকের শুরুতে ভারতে চলে যায় হাজার হাজার পাহাড়ী জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন সময় হামলা, অগ্নি সংযোগের মতো ঘটনায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হয় হাজার হাজার পাহাড়ী পরিবার। এদের পুনর্বাসন নিয়ে সরকারের ভূমিকা নেই। এর মধ্যে যারা ভারত থেকে ফেরত এসে পুনর্বাসিত হয়েছে, তারা এখনও পর্যন্ত জমির দখল পায়নি।

চুক্তিতে উল্লেখ ছিল, ধারাবাহিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলো প্রত্যাহার করা হবে। বাস্তবে প্রত্যাহার তো দূরে থাক, দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানকার পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে প্রতি মুহূর্তে নজরদারিতে থাকতে হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাহাড়ী-বাঙালি বিরোধকে মদত দিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা জাগিয়ে তুলছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় পাহাড়ি-বাঙালি বিরোধ দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি প্রত্যেক শাসক সমতলের নদীভাঙ্গা অসহায় গরীব মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার কথা বলে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। যার ফলে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শাসকদের মদতে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি 'বাঙালি ছাত্র পরিষদ' ব্যানারসহ নানা ব্যানারকে ব্যবহার করছে।

আমাদের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তা ধারণ করার পরিবর্তে তাদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে। পাহাড় ও সমতলের গরীব মানুষদের মধ্যে বিভেদের দেয়াল তৈরি করেছে। আমাদের সংবিধানেও পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তার কোনো স্বীকৃতি নেই। বাংলাদেশে ৪৫টি আদিবাসী গোষ্ঠীর অবস্থান রয়েছে পাহাড়ে ও সমতলে। তাদের ভাষার সংখ্যা ৩২টি। তাদের ভাষা-সংস্কৃতি আজ হুমকির সম্মুখীন। তাদের অস্তিত্ব ক্রমশ বিপন্ন।

আজ দেশে দেশে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র ছোট ছোট জাতিসত্তার উপর জাতিগত নিপীড়ন নামিয়ে এনেছে। আমাদের এই রাষ্ট্র তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতিমুহূর্তে শাসকগোষ্ঠী কখনও চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলে, কখনো পাহাড়ী-বাঙালি বিরোধকে উস্কে দিয়ে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করে তার ফ্যাসিবাদী শাসন পাহাড়ে কায়েম করেছে। এর বিরুদ্ধে পাহাড় ও সমতলের গরীব মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন জরুরি।

দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা
ঘটনার নেপথ্যে

দেশে দেশে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী সহিংসতার ঘটনা বেড়েই চলেছে। গোটা দুনিয়াজুড়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায়গত-মৌলবাদী পথ-পন্থার বলি হচ্ছে হাজার হাজার প্রাণ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধর্মকে ব্যবহার করেই প্রধানত তাদের স্বার্থ হাসিল করছে। ধর্মের সাথে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এখন বেশ আলোচিত। আমরা '*সাম্যবাদ*'র পক্ষ থেকে এই সব বিষয়ের সাথে যুক্ত নানা প্রশ্ন-প্রসঙ্গ নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করছি।

বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় সন্ত্রাস-সংঘাত বাড়ছে

গত কয়েকদিন আগের মিশর। নামাজ পড়ছিল মানুষ। আচমকা বিস্ফোরণের শব্দ। দিগ্বিদিক ছোটাছুটি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নেমে এলো বুলেট বৃষ্টি। মুহূর্তেই ধড়ফড়িয়ে লুটিয়ে পড়ে নিথর হলো দুইশ আশিটি তাজা প্রাণ! যেন বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো রক্তবাণ বয়ে গেল। পাকিস্তানের একটা স্কুলে শতাধিক শিশুদের গুলি করে হত্যা করার খবর নিশ্চয়ই আমরা কেউ ভুলিনি। রক্তাক্ত হলো গ্রীস, প্যারিস, মুম্বাই। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, ফিলিস্তিনসহ পুরো মধ্যপ্রাচ্য যেন বোমা-গুলি,আহাজারি-রক্ত-মৃত্যু আর ধ্বংসের ধূসর ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। এমন সন্ত্রাস-সহিংসতায় প্রতিটা দিন মানব সভ্যতা যেন লাশের ভারে ভারী হয়ে চলেছে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল এন্টোনিও গটারেস প্রকাশিত পরিসংখ্যানে ২০১৬ সালে মোট ১০০টি দেশে ১১,০০০ সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে। আর তাতে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ২৫,০০০ মানুষ। আহত হয়েছেন ৩৩,০০০ মানুষ। এই হামলার তিন চতুর্থাংশ ঘটেছে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, সোমালিয়া ও নাইজেরিয়াতে। এসব হামলা-সন্ত্রাস-সহিংসতার অন্তর্গত কারণ কী, বোঝা দরকার সেটাই।

ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ধর্মের রূপ আর ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের তৎপরতা এক কথা নয়

মানব সভ্যতায় বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে ঐ সময়ের প্রাসঙ্গিক কারণেই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ক্রমে সেই ধর্মও বিবর্তিত হয়েছে। একেকটি ধর্মেরই নানান ধারা-উপধারার মতাবলম্বী গড়ে উঠেছে। সামন্তবাদের গোড়াপত্তনকাল থেকে আধুনিক পুঁজিবাদের উন্মেষকাল – ধর্মবিশ্বাস ও চর্চার মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন অবশ্যই উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দরুন। আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠেছে এই সময়ে। শিল্প বিপ্লব কিংবা রেনেসাঁ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইহজাগতিক ভাবধারার জন্ম হয়েছে। অনেক রাষ্ট্রই নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাসকে তার রাষ্ট্রিক আচার থেকে *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

পিইসি পরীক্ষা বাতিল হচ্ছে না
সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও শিক্ষাব্যবসার কারণে

'রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল' – একটি বহুল ব্যবহৃত প্রবাদ বাক্য। প্রবাদ বাক্যটি প্রচলিত আছে নির্মম দায়িত্বহীনতার প্রকাশ হিসেবে। নিরো ছিলেন জুলিও-ক্লডিয়ান রাজতন্ত্রের সর্বশেষ রোমান সম্রাট। আর যে অগ্নিকাণ্ডের কথা বলা হয় তা ঘটেছিল ৬৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এটি ছিল রোমের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অগ্নিকাণ্ড। কথিত আছে, নিরো চেয়েছিলেন এমন ঘটনা। আগুনে সব পুড়ে যাবার পর সেখানে তিনি একটি স্বর্ণগৃহ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার (পিইসি) আলোচনায় রোমের ঘটনা 'ধান ভানতে শিবের গীত'র মতো শোনালেও নিরোর মতো এমন চরিত্র আমাদের দেশে বিরল নয়। জনগণের 'ত্রাহি মধূসুদন' অবস্থা হলেও শাসকের চাওয়াটাই এখানে শেষ কথা। কেননা শাসকদের কিছু উদ্দেশ্য বা এজেন্ডা থাকে, যা সে বাস্তবায়ন করে বাহ্‌বা পেতে চায়। তা করতে গিয়ে জনগণের কী হবে, তাতে তাদের থোড়াই কেয়ার।

এই নিয়ম সবক্ষেত্রে অনুসৃত হয়। যেমন ঘটেছে পিইসি পরীক্ষা চালিয়ে যাবার ঘটনায়। এমন নয় যে, এই পরীক্ষা বন্ধের দাবিতে কোনো প্রতিবাদ হয়নি। ২০০৯ সাল থেকে পিইসি পরীক্ষাটি চালু হবার পর থেকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ অভিভাবক-বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নানা সময়ে প্রতিবাদ করে বলেছেন, এই পরীক্ষা শিশুর শৈশব ধ্বংস করছে, সৃজনশীলতাকে মেরে দিচ্ছে, মুখস্থ ও গাইড বই নির্ভর প্রজন্ম গড়ে উঠছে, অভিভাবকদের কাড়ি কাড়ি টাকা চলে যাচ্ছে, প্রশ্নফাঁস হচ্ছে, স্কুলগুলো একেকটা কোচিং সেন্টারে পরিণত হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু কে শোনে কার কথা? সরকারের মুখে এক রা – 'পরীক্ষা চালুর কারণে শিশুদের পরীক্ষাভীতি কাটছে, ঝরে পড়ার *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

চট্টগ্রামে হোল্ডিং ট্যাক্সবিরোধী লড়াইয়ে প্রমাণিত হলো গণআন্দোলনের বিকল্প নেই

মানুষের মধ্যে খুব প্রচলিত একটি কথা হলো- আন্দোলন করে কিছু হবে না, সরকার যা চায় তাই হয়। গায়ের জোরে যা ইচ্ছা তাই করবে। তাতে মানুষ বাঁচুক আর মরুক। এমনি ফ্যাসিবাদী নিপীড়ন চলছে দেশব্যাপী। সে সময় মানুষের মনে আশা জাগানিয়া হয়ে এসেছে চট্টগ্রামের হোল্ডিং ট্যাক্সবিরোধী আন্দোলন। সংগঠকদের একনিষ্ঠতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহসী ভূমিকা, হাজারো মানুষের সম্পৃক্ততা ছিনিয়ে এনেছে বিজয়।

গত বছরের আগ পর্যন্ত, চট্টগ্রাম শহরে বাড়ির আয়তনের ভিত্তিতে হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করা হতো। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে এই কর ধার্য হতো। ২০১৬ সালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়তনের পরিবর্তে ঘর ভাড়ার ভিত্তিতে ১৭% হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করেছে। যা পূর্বের তুলনায় ১৫/২০ গুণ হারে বেড়েছে। যা ভাড়াটিয়া, বাড়ির মালিক সবার উপর এক বিশাল বোঝা। নগরীতে হোল্ডিং রয়েছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৪৮টি। যা থেকে বিগত বছরে আয় করা হয়েছে ১০৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৩৭ টাকা। এই আইন কার্যকারি করে সিটি কর্পোরেশন আয় করতে চায় ৮৫১ কোটি ৩০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৫৯ টাকা। চাটগাঁবাসীর দাবি তাদের আয়ের উপর সরকার ট্যাক্স ধার্য করছে, তাহলে আবার বাড়ির আয়ের উপর কেন এই গলাকাটা ট্যাক্স আরোপ? এর চাপ পড়বে ভাড়াটিয়াদের উপর।

চট্টগ্রামকে ২য় রাজধানী বলা হলেও চট্টগ্রামবাসী পায় না কোনো নাগরিক সুবিধা, বরং দিন দিন বাড়ছে জনদুর্ভোগ। জলাবদ্ধতা, যানজট, অপরিকল্পিত ফ্লাইওভার, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট রেখে বাড়াতে চাইছে হোল্ডিং ট্যাক্স। আগ্রাবাদ, হালিশহর, বাকলিয়াসহ অধিকাংশ অঞ্চল জোয়ারের পানিতে ডুবে থাকে। সেই অঞ্চলে *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০ বছর পূর্তি
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

বিশ বছর পূর্তি হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির। বড় বড় হরফে শিরোনাম করেছে দৈনিক পত্রিকাগুলো – 'পাহাড় জুড়ে উৎসব শুরু হয়েছে।' সরকারি উদ্যোগে তিন পার্বত্য জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে র‍্যালি-শোভাযাত্রা-সভা-সেমিনার। কোথাও কোথাও আয়োজন করা হয়েছে কনসার্টের। সরকারি উদ্যোগে সাফল্যের বিরামহীন ঢাক পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

কিন্তু যাদের জন্য এ চুক্তি সেই পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা কী? নিজের দেশে প্রতিদিন টিকে থাকার জন্য লড়াই করা তাদের জীবনের কী পরিবর্তন হলো এ চুক্তি দিয়ে? বাস্তবে কিছুই হয়নি। তাদের চোখে মুখে এখনও আতঙ্ক, এখনও অবিশ্বাসের ছায়া। দেশের কাউকে তাদের বিশ্বাস করার উপায় নেই। কয়েক মাস আগেও লংগদুতে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বসত বাড়িতে সেটেলার বাঙালিদের আগুন লাগানোর দৃশ্য তাদের চোখে লেগে আছে। নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করা অথবা রাঙামাটিতে ১৭ বছরের যুবক রোমেল চাকমাকে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দ্বারা নৃশংস হত্যা – সবই বলে দেয় আজ পাহাড়ের কী অবস্থা। এ অবস্থায় উৎসব চলে না।

সরকার বলছে, 'চুক্তির প্রায় সবটুকুই বাস্তবায়িত হয়েছে'। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির (জেএসএস-সন্তু লারমা) সভাপতি সন্তু লারমা সাংবাদিকদের বলেছেন, 'সরকার মিথ্যাচার করছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি সম্পন্ন, ১৫টি আংশিক ও ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে বলে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে এর মধ্যে মৌলিক ধারাগুলোর একটিও বাস্তবায়িত হয়নি।' (সূত্র : প্রথম আলো ২ ডিসেম্বর ২০১৭) এমন আস্থাহীন অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যখন সরকার বর্ষপূর্তির আয়োজন করছে তখন এই চুক্তি ভবিষ্যতে কতটুকু বাস্তবায়িত হবে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। চুক্তির কয়েকটি ধারার উপর আলোকপাত করলে তার অসঙ্গতিগুলো ধরা পড়বে। এবং সরকারের মনোভাবও পরিষ্কার হবে।

চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো 'ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান', যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে 'ভূমি কমিশন গঠন' করা হবে। বাস্তবে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনের *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org